॥ হুতোম প্যাঁচার নক্শা ॥

হুতোম প্যাঁচার নক্সা

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী চিত্রিত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত

নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-২০

প্রকাশক

সুশীলকুমার সিংহ

নতুন সাহিত্য ভবন

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট

কলিকাতা-২০

মুদ্রাকর

দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস

দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ

২৮, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯

অঙ্গসজ্জা

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সচিত্র সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬২

দ্বিতীয় সচিত্র সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৩

দাম চার টাকা

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত
শেষ সংস্করণের প্রকাশকাল : ১৮৬৮

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা

॥ ১ ॥

যাঁদের অকাল-মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্য সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের ভেতরে সর্ব প্রথমেই মনে পড়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা। ১৮৪০ সালের ফেব্রুআরি মাসে তাঁর জন্ম হয়—১৮৭০ সালের জুলাই মাসে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। মাত্র ত্রিশ বছরের এই সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিধির মধ্যে কালী-প্রসন্ন বাঙলা সাহিত্য এবং বাঙালী জাতির জন্যে যে সাধনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন—তার তুলনা হয় না।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত দেওয়ান বংশের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসন্ন। জন্মে-ছিলেন অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং অল্প বয়সেই বিপুল বিত্ত-সম্ভার এসে পৌঁছোয় হাতের মুঠোতে। অতএব বাবুতন্ত্রের কলকাতায়—তখনকার প্রথা অনুযায়ী অধঃপতনের পথ কালী-প্রসন্নের পক্ষে অতিশয় সুগম ছিল। একদিকে পুতুল নাচ, বাই নাচ এবং গণিকা-চর্চার বনেদী বাবুয়ানা, অন্যদিকে মদ্য পান এবং চলনে-বলনে-লেখনে বিকৃতি ইংরেজিয়ানা—গ্রীক্ পুরাণের ইউলিসিসের মত এই শিলা এবং ক্যারিবডিসের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য শক্তির সাহায্যে একটি খাঁটি মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন কালীপ্রসন্ন। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শ সে যুগে একমাত্র কালীপ্রসন্নের মধ্যেই সার্থকভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল কালীপ্রসন্নের জীবনে। উনবিংশ শতকের পূর্ণ প্রগতিশীলতার প্রতিনিধি তিনি। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর কী অপরিসীম শ্রদ্ধা যে ছিল তার উজ্জ্বলতম অভিজ্ঞান হল তাঁর বিপুলতম কীর্তি "মহাভারতের" অনুবাদ। বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে তখনকার সমস্ত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই বিরাট কাজে তাঁর সহায়তা করেছিলেন। মাত্র এই "মহাভারতে"র জন্যে তিনি বাঙালীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু কেবল ঐতিহ্যের চর্চার মধ্যেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়নি। রামমোহনের প্রভাবের ফলে সমকালীন সমাজের যা কিছু কুপ্রথা—যা কিছু গ্লানি—যত কিছু

ভণ্ডামি—তাদের সকলের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর এই বিদ্রোহের সব চাইতে কৌতুককর নিদর্শন হল "টিকি মিউজিয়াম"। তথাকথিত ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের ধর্মপ্রাণতা যে কী পরিমাণে অন্তঃসারবর্জিত, সেইটি প্রমাণ করবার জন্যে অর্থমূল্যের বিনিময়ে তিনি তাদের টিকি কেটে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এমন মর্মঘাতী ব্যঙ্গের দৃষ্টান্ত বাঙলা দেশে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। এই 'শিখামেধ' যজ্ঞের পেছনে কালীপ্রসন্নের যে মনোভঙ্গি নিহিত ছিল—'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' তারই অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি।

কালীপ্রসন্নের সৎকীর্তি এবং সহৃদয়তার তালিকা অফুরন্ত। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে যিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করে সুসাহিত্য সৃষ্টি এবং সমাজ-সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন; প্রগতিশীল নাট্যধারার প্রবর্তনের জন্যে যিনি গড়ে তুলেছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' এবং নাটক রচনাও করেছিলেন তার সঙ্গে; 'মেঘনাদ বধে'র কবিকে প্রথম গণ সংবর্ধনা জানিয়ে যিনি তাঁর হাতে কৃতজ্ঞ বাঙালীর মানপত্র এবং প্রীতির পানপাত্র তুলে দিয়েছিলেন; কুখ্যাত 'নীলদর্পণের' মামলায় রেভারেণ্ড লঙের জরিমানার হাজার টাকা যিনি সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিয়েছিলেন জাতির প্রতিনিধিরূপে; নীলকরদের শয়তানি চক্রান্তে জর্জরিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র লোকান্তরিত হরিশ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারকে যাঁর উদার অর্থসাহায্যই বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল—সেই কালীপ্রসন্ন সিংহের স্মৃতির প্রতি আমরা আজও যথোচিত কর্তব্য করিনি। এ ছাড়াও সংবাদপত্র সেবায়, দানে-দাক্ষিণ্যে, দেশপ্রেমে, শিক্ষার আনুকূল্যে—এমন কি কলকাতায় প্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রবর্তনে—এক কথায় সমসাময়িক জীবনের সমস্ত প্রগতিশীল ভূমিকাতেই আমরা কালীপ্রসন্নকে দেখতে পেয়েছিলাম। এই বিরাট মানুষটির অপূর্ব জীবন-সাধনার পরিচয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জীবনী-গ্রন্থটিতে সবিস্তারে পাওয়া যাবে।

আমরা সত্যিই আত্মবিস্মৃত। তা না হলে বৎসরে অন্তত একবারও তাঁর স্মরণোৎসবের আয়োজন করে নিজেরাই চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করতাম। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর 'রেনেসাঁসে'র অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র কালীপ্রসন্ন সিংহকে ভুলে যাওয়ার দুর্ভাগ্য আমাদের পরমতম লজ্জার বস্তু।

॥ ২ ॥

কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' অনন্ত সমাজচিত্র। শুধু চিত্র বললে ঠিক হয় না—বইটি আসলে চিত্রশালা—'পিকচার গ্যালারি'। চড়ক-পার্বণের রঙ্গ, বারোয়ারীর নামে সমকালীন সমাজের দুর্নীতি ; মরা ফেরা, ছেলে ধরা, মিউটিনি, সাতপেয়ে গোরু, আর দরিয়াই ঘোড়ার হুজুগের ব্যঙ্গ-প্রসঙ্গ, বিচিত্র বুজরুকির নমুনা, হঠাৎ অবতার পদ্মলোচন দত্তের শ্লেষতিক্ত উপাখ্যান, মাহেশের স্নানযাত্রার বর্ণনা, রামলীলায় হট্ট উৎসব এবং নব প্রবর্তিত রেলওয়ের অতি বাস্তব চিত্র—হুতোমের নক্শা থেকে এরা কেউই বর্জিত হয়নি। শুধু বিশুদ্ধ সমাজচিত্র নয়—সংস্কারব্রতীর উপদেশও নয়—রসসৃষ্টি হিসেবেও 'নক্শা'র একটি অসামান্য মর্যাদা আছে। বইটি উপন্যাসের চাইতেও সুখপাঠ্য। এমন একটি উপাদেয় গ্রন্থের সঙ্গে সচরাচর আমাদের পরিচয় ঘটে না।

'নক্শা' অবশ্য এই পর্যায়ের প্রথম বই নয়। সমাজ-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভ্রান্তি অনাচারের বিরুদ্ধে প্রথম কলম ধরেছিলেন 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র বিশ্রুতনামা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাবুর উপাখ্যান' দিয়ে তার আরম্ভ এবং পরিণতি যথাক্রমে 'কলিকাতা কমলালয়' 'নববাবুবিলাস' এবং 'নববিবিবিলাসে'র মধ্যে। সেকালে কলকাতার সমাজক্ষেত্রে—বিশেষতঃ নব্যতন্ত্রীয়দের ভেতরে যে সমস্ত অসঙ্গতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, ভবানীচরণের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল সেইদিকেই। তাঁর কলমে ধার ছিল, আক্রমণের মধ্যে সত্যতাও ছিল। কিন্তু তবুও এ কথা ভোলা যায় না যে ভবানীচরণ সে-যুগের রক্ষণশীল মনোভাবের প্রধানতম প্রবক্তা। সমসাময়িক অধিকাংশ প্রগতিশীল আন্দোলনের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন—রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণ প্রসঙ্গে তাঁর ভূমিকা সব চাইতে লজ্জাকর। সমসাময়িক ভট্ট পল্লীর মনোভাব এবং শোভাবাজার রাজবাড়ির দৃষ্টিকোণই তাঁর রচনার মধ্যে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে। তাই সদিচ্ছা সত্ত্বেও ভবানীচরণের ব্যঙ্গচিত্র একদেশদর্শী। তাঁর রুচিরও প্রশংসা করা চলে না—সেদিক থেকে তিনি 'রসরাজের' গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য এবং ঈশ্বর গুপ্তের সমধর্মী। কুরুচিকে আঘাত করতে গিয়ে ভবানীচরণ নিজেই যে কতখানি অশ্লীল হয়ে উঠেছেন 'নববাবুবিলাস' এবং বিশেষ করে 'নববিবিবিলাসে' তার পরিচয় আছে।

সমাজচিত্র রচনায় ভবানীচরণের পরবর্তী স্মরণীয় প্রতিনিধি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম বাঙলা সামাজিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে। 'আলাল' বেচারাম বাবু এবং তস্য দুলাল কাহিনীর নায়ক (অথবা 'ভিলেন') মতিলাল, বালীর বেণীবাবু, স্কুল মাস্টার বাঞ্ছারাম, সর্বোপরি স্বনামধন্য ঠক চাচার অপূর্ব চরিত্র-চিত্র রচনা করেছেন টেকচাঁদ। ভাষার দিক থেকেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য—তাঁর প্রায় লোকায়ত সহজ-রীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গম্ভীর মধুর রচনা পদ্ধতির মিলনেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইলের জন্ম।

কিন্তু সমাজচিত্র রচনার চাইতেও প্যারীচাঁদের উপন্যাস রচনার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। সে উপন্যাস 'রমন্যাস' নয়—আদর্শবাদী প্রচারণার প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি প্যারীচাঁদ তাঁর উদ্দেশ্যকে কখনো গোপন করেননি। একদিক থেকে ভবানীচরণ যেমন প্রাচীন দলের মুখপাত্র, প্যারীচাঁদ তেমনি অপর পক্ষে নব্য দলের বাণীবহ। প্রাচীনপন্থীদের অন্যতম আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ব্রাহ্ম-সমাজের সুনীতি ও সুরুচির প্রধান আদর্শগুলিই তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। প্যারীচাঁদের আদর্শবাদিতার আরো সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর "অভেদী"তে—কিংবা "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়ে"র মধ্যে। তাই আত্যন্তিক আদর্শবাদে চিহ্নিত "আলালের ঘরের দুলাল"কে আমরা সম্পূর্ণভাবে সমাজচিত্রের মূল্য দিতে পারি না—এর ওপর "স্কুল বুক সোসাইটি"র স্থূল হস্তাবলেপ লক্ষ্য করা যায়। "আলালে"র গুরুত্ব এবং মহিমার ক্ষেত্র আলাদা।

"আলাল" প্রকাশিত হওয়ার চার বছর পরে "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" আবির্ভূত হয়। আবির্ভাব যে চাঞ্চল্যকর হয়েছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তার কারণ, এই "নক্শা"র মধ্যে কাল্পনিকতার স্থান ছিল না বললেই চলে। দুঃসাহসী কালীপ্রসন্ন দেশের কুপ্রথা, মূঢ়তা, ভণ্ডামি এবং ইতরামীর একেবারে ফোটোগ্রাফিক ছবি যেন তাঁর একস-রে লেন্সে ধরে ফেলেছেন। কোথাও বাস্তব নামধাম বজায় রেখে, কখনো বা সামান্যমাত্র আবরণ রেখে তিনি অনেক তথাকথিত "বিখ্যাত" ব্যক্তির খাঁটি চরিত্রটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্পর্কে যা বলেছিলেন—কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধেও সে উক্তি প্রযোজ্য : তিনি তুলি ধরে সামাজিক বৃক্ষে সমারূঢ় বানরের ল্যাজ সুদ্ধ এঁকে দিয়েছিলেন।

মধুচক্রে যে লোষ্ট্রপাত ঘটেছিল, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। যাঁদের গাত্রদাহ আরম্ভ হল, তাঁদের পক্ষ থেকেও প্রত্যুত্তরের চেষ্টার অভাব হল না। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উতোর গাইলেন "আপনার মুখ আপনি দেখ"। কিন্তু হুতোমের সত্য ও স্পষ্টভাষণে তাঁরই দল ভারী হয়ে উঠল। হুতোমপন্থী 'সমাজ কুচিত্রে'র লেখক 'নিশাচর' হুতোমকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে এইভাবে ভোলানাথকে বিধ্বস্ত করলেন :

'বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদ্‌মায়েশদের তাক্ লেগে গ্যালো, ছেলেরা চম্‌কে উঠ্‌লো, আমরা জেগে উঠ্‌লুম্, চিড়িয়াখানায় নানাপ্রকার স্বর শোনা যেত্তে লাগ্‌লো। 'আপনার মুখ আপনি দেখ' এগিয়ে এলো। আমরা তারে চেনো চেনো কোরে ধরে ফেল্লেম, সেটা পাখী নয়, সুতরাং উড়তে পাল্লে না, আপনার ফাঁদে আপনিই ধরা পড়লো।' (সমাজ কুচিত্র—আমাদের গৌরচন্দ্রিমা)

সব চাইতে কৌতুকের ব্যাপার এই যে শেষ পর্যন্ত এই ভোলানাথকেই কালীপ্রসন্নের অসীম অনুকম্পার দারস্থ হতে হয়েছে। 'আপনার মুখ আপনি দেখ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্যে ভোলানাথ কালীপ্রসন্নের কাছে কাতর নিবেদন জানিয়েছেন, "শ্রীতালাহুল ব্ল্যাক-ইয়ার, প্রকাশক"—স্বাক্ষরিত 'নক্‌শার' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সে চিঠিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'ব্ল্যাক্-ইয়ার' (অথবা 'হুতোম' ?) এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

ফলে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বমন অপহরণ করে বামনের চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্‌শার উত্তর দিতে অগ্রসর হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহুদিন ঐ ব্যবসা চললো না। ......এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন।'

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের চিঠির শেষে একটি অধ্যাত্ম ভাবমূলক কবিতা আছে। হুতোম নিজের নাম প্রকাশ করেননি—ভোলানাথেরও নয়—কিন্তু এই কবিতার অন্তরালে দুজনের নামই সংকেতে প্রচ্ছন্ন।

এই ভিক্ষাপাত্রের দ্বারা একটি সত্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। 'হুতোমের' জয়যাত্রার সামনে কোন প্রতিপক্ষই সেদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তার কারণ, অকৃত্রিম দেশপ্রেম আর সত্যের শক্তিই ছিল কালীপ্রসন্নের অমোঘ যুদ্ধাস্ত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদকে প্রশংসা করেছেন—অভিনন্দনও জানিয়েছেন। কিন্তু হুতোম তাঁর প্রীতি কটাক্ষ লাভ করতে পারেননি। হুতোমের ভাষা বঙ্কিমের ভালো লাগেনি—বক্তব্যও নয়। কিন্তু যুগসম্রাট বঙ্কিমের রাজকীয় উপেক্ষা সত্ত্বেও 'নক্শা' তার নিজস্ব মর্যাদায় স্বমহিম।

হুতোম তাঁর ভূমিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, "এই নক্শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই।" এর ভেতরে ব্যক্তিবিশেষ তাঁর নিজস্ব প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেও লেখকের বক্তব্য নির্বিশেষ। "আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ং নক্শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।" এক কথায় এটি তৎকালীন কলকাতার সমাজ এবং ব্যক্তি চরিত্রের একটি সামগ্রিক চিত্র। কালীপ্রসন্নের মনোগত অভিলাষ ছিল দীনবন্ধুর মত একটি 'দর্পণ' হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু নীলকরদের বর্বর প্রতিহিংসার কথা চিন্তা করে তাঁকে নিবৃত্ত হতে হয়েছে :

"দর্পণে আপনার কদর্য মুখ দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখেশুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না—"

তাই তাঁকে 'সং সেজে রং কত্তে' হয়েছে। কিন্তু এই 'রং'-এর উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে তাঁর। হুতোমের ঠোঁটের ঘায়ে সামাজিক বানরেরা রক্তাক্ত হয়েছে। "আজব শহর কলকেতা"র কোন বিকৃতি কোন গ্লানি তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

রুচির দিক থেকে হুতোম অসাধারণ সংযত। এক 'মাহেশের স্নানযাত্রা'র সামান্য কিছু অংশ ছাড়া বইখানি নির্মল কৌতুকে উদ্ভাসিত। অথচ ইচ্ছা করলেই কালীপ্রসন্ন ভবানীচরণের মত প্যারডির ছলে প্রচুর কুরুচির সরসতা করতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের ওপর সুবিচার করেননি।

'নক্শা'য় সমস্ত স্তরের মানুষেরই ছবি আছে বটে, কিন্তু কালীপ্রসন্ন মুখ্যতঃ আঘাত করেছেন "হঠাৎ বাবুদের"। সে যুগে নানারকম জাল-জুচ্চুরি এবং ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে যাঁরা রাতারাতি বড় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, শহরের গ্লানি-মন্থনের কাজে তাঁরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বীরকৃষ্ণ দাঁ এবং পদ্মলোচন দত্তের দল তার সার্থক উদাহরণ। অপসক্তিত

অর্থের বাম্পে ফেঁপে-ওঠা বেলুনের মত এই সমাজশত্রুর দলকে বিদ্রূপের কশাঘাতে তিনি জর্জরিত করেছেন। তাঁর হাতে 'হঠাৎ অবতার' পদ্মলোচনের বিশ্লেষণ এই রকম :

"হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও হয় না। ...কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুললে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে! ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে শহরের বড় দলে খবর হল যে কলকেতার ন্যাচ্‌রাল হিষ্ট্রীর দলে একটি নম্বরে বাড়লো!"

এই ছবির সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্গতির জন্যে অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন লেখক। বাঙালী ধনী সম্প্রদায়ের হাতে দেশ এবং জাতির সর্বতোমুখী উৎকর্ষ সাধিত হবে—এ প্রত্যাশা তাঁর ছিল। কিন্তু ইংরেজিতে যাকে "Ill begotten money" বলে—তা সমস্ত দেশকে আরো বেশি করে সর্বনাশের দিকেই এগিয়ে দিল। "যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্যে কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষেরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে।"

এই সদিচ্ছাই "হুতোম প্যাঁচার নকৃশা"র মূল অনুপ্রেরণা। শুধু আক্রমণের তীক্ষ্ণতাই নয়—পত্রে পত্রে প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়েছে। তিনি যতখানি আঘাত করেছেন, আহত হয়েছেন তার চাইতেও বেশি। শ্রেষ্ঠ শ্লেষশিল্পীর—স্যাটায়ারিস্টের এইটিই আদর্শ। জাতি এবং সমাজকে ব্যঙ্গ করবার অধিকার মাত্র তাঁরই আছে—যিনি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। যেখানে প্রীতি নেই—সহানুভূতি নেই—হৃদয়হীনতার সেই আঘাতের মধ্য দিয়ে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে না। তার নির্মমতায় জাতির কল্যাণ হয় না—মানুষ আত্মশুদ্ধির জন্যে অনুপ্রাণিত হয় না—বরং হিংস্র ক্ষোভে উত্যক্ত হয়ে ওঠে। সহানুভূতির অশ্রু রেখাই 'হুতোম প্যাঁচার নকৃশার' ধ্রুবপদ।

কালীপ্রসন্নের সমবেদনার উজ্জ্বলতম চিত্র 'রেলওয়ে'। সাধারণ দরিদ্র মানুষ যারা—যারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী—তাদের যে ছবি কালীপ্রসন্ন ফুটিয়েছেন—তার ভেতর দিয়ে এমন এক মর্মভেদী কারুণ্য প্রকটিত হয়েছে যে কৌতুকের

সমস্ত আবরণকে তা বারে বারে ছাপিয়ে গেছে। কি ভাবে এই মানুষগুলি পদে পদে বঞ্চিত হয়, কেমন করে অসাধু রেলকর্মচারীর দল তাদের ওপর উৎপীড়ন করে—জমাদার আর চাপরাসীদের বেত কী নির্মমভাবে তাদের রক্তাক্ত করে দেয় এবং সর্বশেষে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে তারা কি ভাবে স্থানলাভ করে—কালীপ্রসন্নের এই বর্ণনাগুলির তুলনা নেই।

"যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্ল্যাকহোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই কোম্পানীর থার্ড ক্লাস দেখলে একদিন এদের এজেণ্ট্ ও লোকোমোটিব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌কে সাহস করে বলতে পাত্তেন যে, তাঁদের থার্ড ক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্ল্যাকহোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড় কম নয়।"

ব্যক্তিজীবনে কালীপ্রসন্ন নির্ভীক দেশপ্রেমের যে পরিচয় দিয়েছিলেন—'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'তেও তা আছে। সুপ্রীম কোর্টের জাস্টিস মর্ডাণ্ট্ ওয়েল্‌স্ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজের যোগ্য প্রতিনিধি—তাঁর বক্তব্য ছিল "বাঙালীরা মিথ্যাবাদী ও বব্বলের (বর্বরের?) জাত।" এই স্পর্ধার প্রতিবাদে দেশের নেতারা রাজা রাধাকান্ত দেবের নাট মন্দিরে যে বিরাট সভার আয়োজন করেন—সেই সভায় কালীপ্রসন্ন জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'নক্‌শা'তে সে কাহিনীও আছে। সেই সভা থেকে এক প্রতিবাদ-লিপি ইংলণ্ডে সেক্রেটারী-অব্-স্টেটের কাছে পাঠানো হয়। দেশের একদল ইংরেজ পদলেহী এই সভার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তাঁদের ব্যঙ্গ করে হুতোম বলেছেন—"ওয়েল্‌সের বিপক্ষে বাঙালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লাগলেন।" কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে এই সভায় যে জনমত প্রকাশিত হল, তাতে "দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের (সার চার্লস উড) কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েল্‌স্‌ও ব্রেক হলেন।" অর্থাৎ স্যার চার্লস উডের নির্দেশে গভর্নর জেনারেলের ধমকে ওয়েল্‌স্ ঠাণ্ডা হয়ে যান।

'মিউটিনি' প্রসঙ্গে বাঙালীর ভীরুতাকে লেখক তীব্রতম আঘাত হেনেছেন। 'পাদ্রি লং ও নীলদর্পণে' নীলকরদের অত্যাচারের প্রতি তাঁর অন্তর্জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে। বহু বিচিত্র কাহিনী ও টুকরো টুকরো ঘটনার আশ্রয়ে

কালীপ্রসন্ন এই বইটিতে জাতীয় জীবনের যে স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন—তার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ।

তাই সমাজ-সচেতন সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে 'নক্‌শা'র মূল্য অপরিসীম। এর রসের দিকও উপেক্ষণীয় নয়। রঙ্গে, ব্যঙ্গে, পর্যবেক্ষণে এবং চিত্ররচনায় হুতোমের মৌলিকতা অসাধারণ।

আঙ্গিকের দিক থেকে বইটির চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষা। একেবারে সর্বজনবোধ্য চল্‌তি ভাষায় লেখা বই হিসাবে বাঙলা গদ্যে এইটিই প্রথমতম। 'আলালের ঘরের দুলালে' চল্‌তি রীতির একটা ধাঁচ আছে বটে, কিন্তু তার ভিত্তি মোটামুটি সরলীকৃত সাধুভাষা। কালীপ্রসন্ন ভাষার প্রয়োগে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত। অসীম দুঃসাহসের সঙ্গে যেমন তিনি তাঁর বিষয়বস্তুটি বেছে নিয়েছিলেন, তার উপযোগী বাগ্‌রীতিও তিনি স্বহস্তেই গঠন করেছেন। তাঁর 'নক্‌শার' সঙ্গে এই ভাষার মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছে।

চল্‌তি ভাষার নিরঙ্কুশ ব্যবহারের ফলে লেখায় কিছু কিছু অসংযম প্রকাশ পেয়েছে—অশালীন শব্দের অবাঞ্ছিত প্রয়োগও ঘটেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে—চল্‌তি ভাষা—প্রকৃত জনের মুখের কথাই যে আগামী দিনের সাহিত্যের বাহন, বীরবলের 'সবুজ পত্রে'র পাতায় এ বাণী ঘোষিত হওয়ার অনেক আগেই কালীপ্রসন্ন সিংহ তার সূচনা করে দিয়েছিলেন। আধুনিক গদ্য রীতির তিনিই পথিকৃৎ। প্রথম প্রয়াসের সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করে তাঁর সৎসাহস ও শক্তিমত্তা আপন গৌরবে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। পরম পরিতাপের কথা, কালীপ্রসন্নের এই সংকেতকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করতে পারলেন না। যদি পারতেন, তা হলে অনেক আগেই তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর ছোঁয়ায় বাঙলা সাহিত্যিক গদ্যে নবযৌবনের জোয়ার আসত।

বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ অমর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" মৃত্যুহীন কৃতিত্ব।*

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

---

* এই মুখবন্ধে 'সাহিত্য পরিষৎ' প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত

বংশ পরিচয় ॥

জোড়াসাঁকো নিবাসী দেওয়ান বংশের নন্দলাল সিংহের একমাত্র পুত্র। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে জন্ম হয়।

শিক্ষা ॥

প্রথমে হিন্দু কলেজে, পরে গৃহশিক্ষকের কাছে।

সংস্কৃতি-সাধনা ॥

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা (জুলাই বা জুন, ১৮৫৩) ;
বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে মধুসূদনের সংবর্ধনা (১২ই ফেব্রুআরি, ১৮৬১) ; ওই সভার উদ্যোগেই রেভারেণ্ড্ লঙের সংবর্ধনা। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন (১৮৫৬)। বিখ্যাত অধ্যাপক ডি-এল্ রিচার্ডসনের বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং তাঁর বিলাতযাত্রার পাথেয়ে সহায়তা।

পত্র-পত্রিকা পরিচালন ॥

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহের কয়েক সংখ্যা সম্পাদন এবং পরিদর্শক পত্রিকা।

সাহিত্য কীর্তি ॥

বাবু নাটক, বিক্রমোর্বশী নাটক, সাবিত্রী সত্যবান নাটক, মালতী মাধব নাটক, হুতোম প্যাঁচার নক্শা (১৮৬১, '৬২, '৬৪), বঙ্গেশ বিজয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারত, হিন্দু পেট্রিয়ট্ সম্পাদক মৃত হরিশ মুখোপাধ্যায়।

দেশপ্রেম ও অন্যান্য কীর্তি ॥

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সমর্থন। বহুবিবাহ-নিরোধে সহযোগিতা। 'নীলদর্পণে'র মামলায় পাদ্রি লঙের জরিমানার টাকা দেওয়া। হিন্দু পেট্রিয়ট্ সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মুদ্রাযন্ত্র ও পত্রিকার স্বত্বরক্ষণ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষে দান। গ্রাণ্ট্ মেমোরিয়াল ফাণ্ডে দান। 'ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র' ও 'সোমপ্রকাশ'কে অর্থ সাহায্য। কলকাতায় প্রথম নিজব্যয়ে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। বাঙালী-বিদ্বেষী স্যার ওয়েল্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় তীব্র ভাষণ। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে অসামান্য ন্যায়নিষ্ঠা। ১৮৭০ সালের ২৪শে জুলাই অকাল মৃত্যু।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

সহৃদয় কুলচূড় শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্মার

বাঙালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষা নিবন্ধন

বিনয়াবনত

দাস

শ্রীহুতোম প্যাঁচা কর্তৃক

(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)

শ্রীচরণে

অঞ্জলি প্রদত্ত হইল

কালীপ্রসন্ন সিংহ

জন্ম ১৮৪০ মৃত্যু ১৮৭

হুতোম প্যাঁচার নকশা : প্রথম ভাগ

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা

আজকাল বাঙালী ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে, বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান্ থাকতো, তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা-নাবুদ হতে পেত না—তা হলে হয়তো এত দিন কত্ব গ্রন্থকার ফাঁসি যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাকতেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেশির ভাগই একচেটে, কাজে কাজেই এই নক্শাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়লো। কথায় বলে, একজন বড়মানুষ তাঁরে প্রত্যহ নতুন নতুন মস্করামো ভাখাবার জন্য একজন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন, সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড়মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো, কিছু দিন যায়, একদিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না, শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকামুটে ভাড়া করে বড়মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত, বড়মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে ঝাঁকামুটের ওপর বসে আসতে দেখে বললে, 'ভাঁড় । এ কি হে ?' ভাঁড় বললেন, 'ধর্মাবতার আজকের এই এক নতুন !' আমরাও এই নক্শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নক্শা প্রচারিত হল, নক্শাখানির দু-পাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নক্শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই—সত্য বটে অনেকে নক্শাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্শার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।

নক্শাখানিকে আমি একদিন আরশি বলে পেশ কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরশিখানি ভেঙে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্‌বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরশি ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হল—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবি মাফ্‌ করবেন।

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা

পাঠক! হুতোমের নক্‌শার প্রথম ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হল। যে সময় এই বইখানি বাহির হয়, সে সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশ্যে) পড়বেন। যাঁরা সহৃদয়, সর্ব সময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্‌শা আদর করে পড়ে সর্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন। যেগুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদ্‌শা, তারা দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কি না? কিংবা কি গাল দিয়েছে বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েচে; সুদ্ধু পড়া কি,—অনেকে সুদ্‌রেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে একথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটি সাধারণের ঘরকন্নার কথা *Household words.*

পাঠক! কতকগুলি আনাড়ীতে রটান, হুতোমের নক্‌শা অতি কদর্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চা খেঁউড় ও পচালে পোরা ও সুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম; একবার ক্যান, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো—ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম তত দূর নীচ নন যে দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন। জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্‌শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্ত-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্‌বেন যে, অজগর ক্ষুধিত হলে আরসুলা খায় না ও গায়ে পিঁপড়ে কামড়ালে ভক্ষ ধরে না। হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।

তবে বলতে পারেন, ক্যানই বা কল্‌কেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্ত-

বর্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বরবাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজলিসে আনা হল, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন্ দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও বর্ধমানের হুজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজ্ড়া থাক্‌তে আসরে এলেন? তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্‌শা বঙ্গসাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভালো করে চোকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হত। এমন কি, এত ঘয়ষেঁষা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নক্‌শায় চিন্‌তে পারেন না ও কি জন্য কোন্ গুণে তাঁদের মজলিসে আনা হল পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষগুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজার মোক্তার মহারাজের জন্যে মেছোবাজার হতে উৎকৃষ্ট জরির লপেটা জুতো পাঠান, মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পায়ে দিয়ে এসেচেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্লেন সেটি পাগড়ির কলগি ও জন্মতিথির দিন মহা সমারোহ করে ঐ লপেটা পাগড়ির ওপর বেঁধে মজলিসে বার দিলেন। সুতরাং পাছে স্বকপোলকল্পিত নায়ক হুতোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ নিয়ে ও স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষতঃ 'বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে ক্যান নাই?' বাঙালী সমাজে বিশেষতঃ শহরে যেমন কতকগুলি পাওয়া যায়; কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ণন করেন।

হুতোমের নক্‌শার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারি চটি বই ছাপান, ও অনেকে হুতোমের উতোর বলে 'আপনার মুখ আপনি দেখেন ও দ্যাখান'। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে সাগরবারিতে আপনার মুখ আপনি দেখে জাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়, তার বর প্রার্থনা করে-ছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক। কিন্তু কত দূর সফল হলেন, তার ভার পাঠক! তোমার বিবেচনার উপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্রদ্বারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়।

ফলে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' গ্রন্থকার হুতোমের বসন অপহরণ করে বামনের চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্‌শার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই

ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে বেচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যবসা চলল না। সাত পেয়ে গোরু, দরিয়াই ঘোড়া ও হোসেন খাঁর জিনির মত সহৃদয় সমাজ জানতে পারেন যে গ্রন্থকারের অভিসন্ধি কি? এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন, সে পত্র এই—

জগদীশ্বরায় নমঃ।—

মহাশয়! 'আপনার মুখ আপনি দেখ' পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠকসমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবেক পূর্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়ের উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া 'দেশাচার সংশোধন পক্ষে পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে' এমত অনেকেই বলিয়াছেন; তাহাতেই শ্রম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে 'দ্বিতীয় খণ্ড আপনার মুখ আপনি দেখ' প্রকাশিত হইবেক এমত লিখিত হওয়ায় অনেকেই তদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন (তাঁহারা পাঠক এবং গ্রাহক সাম্প্রদায়িক এই মাত্র)। উপস্থিত মহৎকার্য পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ মহাশয় মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান ব্যতীত কোনমতে সম্পাদিত হইতে পারে না। আপনার নিঃস্ব ভাব, ধনব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, এ কারণ এই মহৎকার্য মহল্লোকের কৃপাবর্ত্মে না দণ্ডায়মান হইলে কোনক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এ বিষয় সমাধা হইবার নহে। ধনী, ধীর, স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারক এবং দেশের হিতেচ্ছুকই এই মহৎকার্যে উৎসাহদাতা এ বিধায় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্য আর কেহই হইতে পারেন না। আপনার দাতৃত্বতা পরোপকারিত্বতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে, ভারত আপনার যশরূপ যশ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্তা, বর্তমানে মহাশয়ের মতানুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার কৃপাবর্ত্মে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম। মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলেই সত্বরেই দ্বিতীয় খণ্ড 'আপনার মুখ আপনি দেখ' পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি। নিবেদন ইতি, সন ১২৭৪ সাল, তারিখ—২০ জ্যৈষ্ঠ—

পু

লিপিখানিতে, ডাক স্ট্যাম্প দিয়া প্রদান করা বিধেয় বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ায় অপরাধ মার্জনা করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ। অনুজ্ঞার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম কৃপাবলোকন যে রূপ অনুজ্ঞা হইবেক লিখিয়া বাধিত করিবেন।—

কা,য়া রূপ কারাবাসে : কা,লে কালে আয়ু নাশে : ভো,লা মন ভাবে না ভুলিয়ে।
ব লি, তারে সুবচনে : চ লি, তে সুজন সনে : হে লা, করে খেলায় মাতিয়ে॥
স দা প্র, মদেতে মত্ত : ত্যজি প্র, সঙ্গের তত্ত্ব : নিত্য না, চে কুসঙ্গের সনে।
তত্ত্ব র স, পরিহরি : বৃথা র স, পান করি : মনম থ, অনুক্ষণ মনে॥
ভারতে ত র্ক, তা করি : অভেদ ভি ন্ন, তা হরি : দেখাইছে মু ক্তির সোপান।
মন যদি ব সি, তায় : ত্যজে পাপ ম সি, হায় : শুনি মুনি মু খো, গুণ গান॥
ভারত বেদের অ ং, শ : শ্রবণে কলুষ ধ্ব ং, স : ভারতে ভারত পা প হরে।
হরিগুণ-সদত্ ক হ, ভারত লইয়া র হ, ভাগবতে কর আ ধ্যা, নরে॥

হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে এই ভিক্ষুকের পত্রখানি অপ্রচারিত রাখা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু কতকগুলি স্থূলবয় ও আনাড়ীতে বাস্তবিকই স্থির করে রেখেছেন যে, 'আপনার মুখ আপনি দেখ' বইখানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর, ও বটতলার পাইকেররাও ঐ কথা বলে হুতোমের নক্শার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বইখানি বিক্রি করেন বলিই ঐ হতভাগ্য ভিক্ষুকের পত্রখানি অবিকল ছাপানো গেল।—এখন পাঠক! তুমি ঐ পত্রখানিই পাঠ করে জান্‌তে পারবে, হুতোমের নক্শার সঙ্গে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' গ্রন্থকারের কিরূপ সম্পর্ক!

শত্রুঘ্নপুর
১লা এপ্রিল

শ্রীতালা হুল ব্ল্যাক-ইয়ার্।
প্রকাশক।

কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ

"কহই টুনোয়া—
শহর শিখাওয়ে কোতোয়ালী"—টুনোয়ার টপ্পা।

কলিকাতা শহরের চারদিকেই ঢাকের বাজ্‌না শোনা যাচ্চে, চড়্‌কীর পিঠ সড়্‌ সড়্‌ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে: সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই শাড়ি মালকোঁচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁদা সুতা গলায় যত ছুতোর, গয়লা, গন্ধবেনে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—'আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন!'

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিম্‌কীর দাওয়ানিতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড় মানুষ কব্‌লাতে গেলে বাঙালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেনে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়িতে ক্রিয়েকর্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশীলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচির নিত্যসেবা হয়ে থাকে।

এদিকে ছুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরি সুতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সঙ্গতে

নেচে ব্যাড়াচ্চে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্দ হয়ে গিয়েচে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ি করে তুলেচে; আহার নাই, নিদ্রা নাই; ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্টে রপ্টে ব্যাড়াচ্চে, কখনো 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব' চিৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে, কখনো ঢাকের চামর ছিঁড়ছে, কখন ঢাকের পেছনটা দুম্ দুম্ করে বাজাচ্চে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এল, আজ বৈকালে কাঁটাঝাঁপ! আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কানে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুটো বিল্বপত্র নিয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে বৈঠকখানায় উপস্থিত হল; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবু তারে নমস্কার কল্লেন; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা সুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর দিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন, —বাবু তটস্থ!

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজ্‌লো, সূর্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগলো। শহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফড্রাইভিং বগি ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থামত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক, বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্‌লেন—দুই-চারজন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরই পেছনে মালভরা মোদাগাড়ি চললো, পাছে লোকে জান্‌তে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সইস কোচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন—কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ! —কুঠিওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হল, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তিযোগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্চে, আধ ঘণ্টা মাথা চালা হল, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ির ভিতরে খবর গেল; গিন্নীরা পরস্পর বিষণ্ণ বদনে 'কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে' বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন— উপস্থিত দর্শকেরা 'বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাক্‌বে, সন্ন্যাসীর দোষেই

এই সব হয়' এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করে ; অবশেষে গুরু পুরুত, ও গিন্নীর ঐক্য মতে বাড়ির কর্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হল। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার-পাঁচজন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বললে—'মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে, ফুল তো পড়ে না!' সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়েকাণ্ড বন্দ

করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপকান পরে, সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চললেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেঁতে চললো ; মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ্ মনে করে বিষণ্ণ বদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগ্‌লো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌লো, সকলে উচ্চস্বরে 'ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব' বলে চিৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো ; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাতপাখা দু-পাশে চল্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে, আজ বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দু-হাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হল, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত শিবের কাছে 'বাবা ফুল দাও, ফুল দাও,' বারংবার বলতে লাগ্‌লো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হল, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাতা ঘুরুতে লাগ্‌লো, আধ ঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে এক বোঝা বিল্বপত্র সরে পড়্‌লো! সকলের

আনন্দের সীমা নাই, 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো' বলে চিৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠ্‌লো, না হবে কেন—কেমন বংশ!

ঢাকের তাল ফিরে গেল। সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজনতলায় বিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙান হল, ক্রমে সব কাঁটাগুলি মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দু-দিকে টানা ধল্লে,—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো। উঃ! 'শিবের কী মাহাত্ম্য!' কাঁটা ফুটলে বলবার যো নাই! এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু-একজন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্‌তে পারে না। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো; একজন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিত হয়ে উল্‌টো ঝাঁপ খেলে; সজোরে ঢাক বেজে উঠলো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগলেন—'গিন্নীরা বলে দিয়েচেন, ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখলে এজন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না!'

এদিকে শহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসোর ঘণ্টার শব্দ থাম্‌লো। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। 'বেলফুল!' 'বরফ!' 'মালাই!' চিৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে অথচ খদ্দের ফিচ্চে না—ক্রমে অন্ধকার গাঢাকা হয়ে এল; এ সময় ইংরাজি জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিম্‌লের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজি কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায় তার দরজায় ঢুঁ মেরে মেরে বেড়াচ্চেন—এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেষা দেখে বাড়ি ফির্‌বেন! মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা—চোরবাগানের মোড়, জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগাজীর গলি ও আহিরিটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন কেউ তাঁরে চিন্‌তে পার্‌বে না; আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে, কেশে, হেঁচে, লোককে জানান দিচ্চেন যে, 'তিনি সন্ধ্যার পর দু-দণ্ড আয়েস করে থাকেন!'

সৌখীন কুঠিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেছেন। পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চিৎকার করে বিদ্দেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়্চে। পীল ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্তে শিখচে। স্যাক্‌রারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ কাটুরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকান-দার, পোদ্দার ও সোনার বেনেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভা-বাজারে রাজাদের ভাঙা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা ও লোনা

ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের—'ও গামচাকাঁদে, ভালো মাচ নিবি ?' 'ও খেংরাগুঁপো মিন্‌সে, চার আনা দিবি' বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে 'অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান করো দাতাগণ' বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে ; এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো, 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো' চিৎকার হতে লাগলো ; গোল উঠ্‌লো, এবারে ঝুল সন্ন্যাস। বাড়ির সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে ; বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হুজুরেরা দরওয়ান, চাকর ও চাকরানীর হাত ধরে গাজনতলায় ঘুর ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জেলে ভারার নীচে ধল্লে—এক-জনকে তার উপরপানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুঁড়ো ধুনো ফেলতে লাগলো, ক্রমে একে একে ঐ রকম করে দুলে, ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হল ; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার শহর জুড়ুলো, পূর্বের ক সেতার বাজ্‌তে লাগ্‌লো, 'বেলফুল' 'বরফ' 'মালাই'ও যথামত

বিক্রি কয়বার অবসর পেলে, শুক্রবারের রাত্তির এই রকমে কেটে গেল!

আজ নীলের রাত্তির! তাতে আবার শনিবার; শনিবারের রাত্তিরে শহর বড় গুল্‌জার থাকে—পানের খিলির দোকানে বেল-লণ্ঠন আর দেওয়ালগিরি জ্বলচে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন শহর মাতিয়ে তুল্‌চে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়িতে খ্যামটা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুনু রুনু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন। কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা একজন চোর ধরে বেঁদে নে যাচ্চে—তার চারদিকে চার-পাঁচজন চোর হাসচে আর মজা দেখ্‌চে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে; তারা যে একদিন ঐ রকম দশায় পড়্‌বে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজোনতলায় চিৎপুরের হর। ওদের মাটে সিঙ্গির বাগানের প্যালা। ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি। আজ শহরের গাজোনতলায় ভারি ধুম,—চৌমাথার চৌকিদারদের পোহাবারো! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে—'ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটিটি পাচ্চে না,' 'পালদের একধামা পেতলের বাসন গ্যাচে ও গন্ধবেনেদের সর্বনাশ হয়েচে'! আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্দি, সন্ন্যাসীর হোররা ও 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব' চিৎকার।

এদিকে গির্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং, টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গেল —বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েচে। উড়ে বামুনরা ময়দার দোকানে ময়দা পিষ্‌তে আরম্ভ করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারান্দার কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেচে; দু-একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন— 'রামের মা চল্‌তে পারে না' 'ওদের ন-বৌটা কী বজ্জাত মা,' 'মাগী যে জব্দ' প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েচেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেচে। পুলিসের সার্জন, দারোগা, জমাদার, প্রভৃতি গরীবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্‌ মস্‌ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন; সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পা'

খিদিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে শহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্ গস্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন—সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না, চার-পাঁচজন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাচে থাকে, 'হারমোনিয়ম' ও 'পিয়ানো' বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেকটর মহলে একাদশ বৃহস্পতি !!!

গুপুস করে তোপ পড়ে গেল ! কাকগুলো 'কা কা' করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্সা হয়ে এল—মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে—মেচুনীরা ঝকড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েচে। বদ্দিবাটির আলু, হাসনানের বেগুন, বাজরা বাজরা আসচে। দিশি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ি পাল্‌কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন—জ্বর বিকার ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন ; কলিকাতা শহরেও দু-চার গো-দাগাকে প্রাকটিস কত্তে দেখা যায়, এদের ওষুধ চমৎকার, কেউ বলদের মতন রোগীর নাক ফুঁড়ে আরাম করেন ; কেউ সুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন। শহুরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ, সকল রকম রোগেই 'সম্ভ মৃত্যুঞ্জয়' ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেচেন।

টুলো পুজুরি ভট্টচাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্নিং ওয়াকে বেরুচ্চেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েচে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসী না হলে গ্রাহকরা পান না—ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেক্‌ফাস্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য উদয় হলেন।

সেকসন-লেখা কেরানীর মত কলুর ঘানির বলদ বদলি হলে—পাগড়িবাঁধা

দলের প্রথম ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে—সিপ্‌সরকার ও বুকিংক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামানিক ও রিপুকর্ম বেরুলেন। আজ গবর্নমেণ্টের আপিস বন্ধ, সুতরাং আমরা ক্লার্ক, কেরানী, বুককিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখতে পেলাম না। আজকাল ইংরাজি লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে আপিসে যান—পাগড়ি প্রায় উঠে গেল—দুই একজন সেকেলে কেরানীরাই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেনসন্‌ নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগড়ি দেখ্‌তে পাবো না; পাগড়ি মাথায় দিলে আলবার্ডফেশানের বাঁকা সিতেটি ঢাকা পড়ে এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম ও পরামানিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েচে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে, হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হোক না চোটাখোর বেনের ঘরে ও টাকাওয়ালা বাবুদের বাড়িতে একবার যেতেই হবে—'কার বাড়ি বিক্রি হবে,' 'কার বাগানের দরকার,' 'কে টাকা ধার কর্‌বে,' তাহারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেনে ও ব্যাভার বেনে শহুরে বাবুরা দালাল চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শিকার ধরে আনে—বাবু আড়ে গেলেন!

দালালি কাজটা ভালো, 'নেপো মারে দইয়ের মতন' এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়িঘোড়ায় চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক 'রেস্তহীন মুচ্ছুদী' 'চার বার ইন্সল্‌ভেণ্ট' হয়ে এখন দালালি ধরেছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালির দৌলতে 'কলাগেছে থাম' ফেঁদে ফেল্লেন—এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন হেন কর্মই নাই। পেশাদার চোটাখোর বেনে ও ব্যাভার বেনে বড় মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতি জাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান যে জল তাড়া দেন, সুতরাং মনের মতন কোটাল হলে চুনোপুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল। শহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুঁড়ে একেবারে মরিয়া হয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কালীঘাট থেকে আস্‌চে। বেশ্যালয়ের বারান্দা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ, সকের দলের পাঁচালি ও হাপ্‌ আখড়ায়ের দোয়ার, গুলগার্ডেনের মেম্বরই অধিক,—এঁরা গাজন দেখবার জন্য ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বুঝে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—'সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড' বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা, কি করেন, বড় দাদা, সেজো, পিসে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনো কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরোয়াল ফোঁড়া দেখ্‌তে ভালবাসেন; প্রতিমা বিসর্জনের দিন পৌত্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্‌সে হয়েও হীরে বসানো টুপি, বুকে জরির কারচোপের কর্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তোর মালা, হীরের কণ্ঠি, দু-হাতে দশটা আংটি পরে 'খোকা' সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়তো তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর—ভাগ্‌নের চুল পেকে গ্যাছে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ করে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেক্কার তদ্‌বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগেঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পুর্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোনা লাগ্‌ত, এখন লোনা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিস লেগে থাকে—অনেকে তার দরুন একেবারে আঁতকে পড়েন—ঘাগিগোচের পাল্লায় পড়ে শেষ সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদাব প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান। দুকুরব্যালা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, জন দশ-বারো মোসাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোশাক, গলায় মুক্তার মালা—দেখ্‌লেই চেনা যায় যে, ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্তিমান্ মা! বিসর্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুন গা ঢাকা দেন। রবিবার, পালপার্বণ, বিসর্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ি চড়ে বেরোন।

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ, দুই একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোনাগাজীতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচুল দেখে অনেক শহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ

কাশীপুর, বোড়ন্তা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চব্বিশ ঘণ্টা সোনা-গাজীতেই কাটান, লোকের বাড়ি চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন ; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জ্যাটা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গি উপস্থিত হয়—পেড়াপেড়ি হলে দেশে সরে পড়েন,—সেথায় রামরাজ্য !

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড় মানুষ শহরে এলেই প্রথমে দালাল পেশ হন। দালাল, বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ি যোগাড় করা, খ্যামটা নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটিকেল এজেন্টের কাজ করেন। সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ম—বালির ব্রিজ,—বাগবাজারের খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজানো বৈঠকখানা,—ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ি নিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টি কর্মে মকরর হন।

আজকাল শহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্ট্'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'। প্রথম দলের সকলে ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকাণ্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি, সালু মোড়া,—হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পলিটিক্স ও বেস্ট নিউজ অব দি ডে নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, কেবল সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নির্বাসিত হয়েছে ; এঁরাই ওল্ড ক্লাস।

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র ; বলতে গেলে এঁরা এক রকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভালো চেষ্টা করেন। 'ক্যামন করে আপনি বড়লোক হব', 'ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে,' এই এঁদের নিয়ত

চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার—চার আনার বেশী দান নাই!

সকাল বেলা শহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকিলের বাড়ির হেড কেরানী তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন চারটি 'ইকুটি', দুটি 'কমন্ লা' আদালতে ঝুলচে। কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উট্‌নোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। 'শমন,' 'ওয়ারিন,' 'উকিলের চিঠি' ও 'সফিনে' বাবুর অলংকার হয়েচে। নিন্দা, অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দাহ কচ্চে 'অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা,' অঙ্কিত আংটি আঙুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না।

কোথাও একজন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কায়ে-খেকো ঘুঁড়ির মত ঘুচ্চেন। পরশু দিন 'বউ বউ' 'লুকোচুরি' 'ঘোড়া ঘোড়া' খেলেচেন, আজ তাঁকে দাওয়ানজীর কূটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকিলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে সরে বসতে হবে, নইলে ওঠ্‌সার কিস্তিতেই মাত! ছেলের হাতে ফল দেখ্‌লে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার—কেউ 'স্বর্গীয় কর্তার পরম বন্ধু', কেউ স্বর্গীয় কর্তার 'মেজো পিসের মামার খুড়োর পিসতুতো ভেয়ের মামাতো ভাই' পরিচয় দিয়ে পেশ হচ্চেন, 'উমেদার' 'কন্যাদায়' (হয়তো 'কন্যাদায়ের' বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুটচেন; আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান রয়েচে—সময়ে আমলে আসবে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েচে। চৌমাথার বেনের দোকান লোকে পুরে গ্যাছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগলসআঁটা শাইনিং লেদর, কারো ইণ্ডিয়া রবার আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ড চেন গলায়, আলবার্ট ফ্যাসানে চুল ফেরানো। কলিকাতা শহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু-পাশে অনেক আমোদ গেঁড়ে মহাশয়েরা দাঁড়িয়েচেন; ছোট আদালতের উকিল, সেক্‌সন রাইটর, টাকাওয়ালা গন্ধবেনে, তেলী, ঢাকাই কামার আর ফলারে যজ্‌মেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে, কারু তিনটে ছেলে।

কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—সুবর্বন চৌকিদারের মত পোশাক—পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙের চোঙাকাটা টুপি। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা একমনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না! পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ-মার সঙ্গে ঝকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হত, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে—আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়!

চিৎপুরের বড় রাস্তা মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গট্‌রার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে ছুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশে বেঁধে কাঁদে করেচে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলোমেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গতে 'ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা,' ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচোনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরওয়ান, হরকরা, সেপাই। মধ্যে সর্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্বতী সাজা সং। তার পেচোনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুঁড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেচে। পাশে বেনোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ্, উপরে শোলার চিংড়িমাছ বাঁধা। সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে রং বাজাচ্চে। পেচোনে বাবুর ভাগ্‌নে, ছোট ভাই বা পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ি চড়ে চলেচেন—তাঁরা রাত্রি

তিনটের সময় উঠেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে ও কালীঘেটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে

বাজনার শব্দে ঘোড়া ক্ষেপেচে—হুড় মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।
ক্রমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেটঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গ্যাচে; অমনি মার্শল ল জারি হল, ঢাক বাজালে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেত্তে কোঁতকা পড়বামাত্রই শহর নিস্তব্ধ হল। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।
শহরটা কিছুকালের মত জুড়ুলো। বেনোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুক্‌লো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাতপাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেল্লে। গাজনতলায় শিবের ঘর বন্ধ হল—এ বছরের মত বাণফোঁড়ার আমোদও ফুরুলো। এই রকমে রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল।
আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্ব কালের এক বৎসর গেল দেখে যুবক যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গেল দেখে আহ্লাদের পরিসীমা রইল না। আজ বুড়োটি বিদেয় নিলেন, কাল যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা যে সব কষ্ট

ভোগ করেচি, যে সব ক্ষতি স্বীকার করেচি—আগামীর মুখ চেয়ে আশার মন্ত্রণায় আমরা সে সব মনে থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জন দিলেম। ভূত কাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল মাস্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরানো হাকিম বদলি হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুক্ পুক্ করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠ্‌লে নতুন মাস্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে—মড়ুঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়েসে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরানোর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউ ইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাঁড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ করে স্থান—নেশার খোয়ারির সঙ্গে পুরানোকে বিদায় দেন। বাঙালীরা বছরটি ভালো রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হোক, সজ্‌নে খাড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে পুরানোকে বিদায় দেন। কেবল কলসী উচ্ছুগ্‌গু কর্ত্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপুর্ব্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য বড় ধুম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবা-বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ক্রটি করেননি। আজকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার কি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত করে মড়াকান্না কাঁদ্‌তেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুজতে পার্‌বেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুন্‌তে পারবেন না; ক্রমে ক্রিশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি-কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। শহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ি, ফেটিং ও স্টেট ক্যারেজে নানা রকম পোশাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন, কেউ কাঁসারীদের সংয়ের মত পালকি গাড়ির ছাতের উপর বসে চলেচেন—ছোট লোক, বড় মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে শহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন, ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্দেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দু-গাছি আটা ও একটু স্যাব্‌ড়ানোর বদলে—ফাউলকরি রোল্ রুটি ইণ্ট্রডিউস হল। শ্বশুরবাড়ি আহার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হল দেখে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকুঠেলা ও ভালুকের লোম ব্যাচা কল্‌কেতায় থাক্‌তে লজ্জিত হতে লাগ্‌লো। থরকামান চৈতন্ত ফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফ্যাশান ভর্তি হলেন। চাবির থলো কাঁদে করে টেনা ধুতি পরে দোকানে যাওয়া আর ভালো দেখায় না, সুতরাং অবস্থামত জুড়ি, বগি ও ব্রাউহাম্ বরাদ্দ হল। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু-একজন ভদ্রলোক মোসাহেব, তকমা আরদলী ও হরকরা দেখা যেতে লাগ্‌লো। ক্রমে কলে, কৌশলে, বেনেতি বেসাতে টাকা থাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা শহরে কতকগুলি ছোটলোক বড় মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুন ওড়া বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন—প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশ বালিশ আছে—'যে আজ্ঞে' ও 'হুজুর আপনি যা বল্‌চেন, তাই ঠিক' বলবার জন্যে দুই এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে-করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভকর্মে দানের দফায় নবডঙ্কা! কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিস্‌টের খরচে চার-পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা শহরের আমোদ শিগগির ফুরায় না, বারোইয়ারি পুজোর প্রতিমা পুজো শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সে সব বল্‌তে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাটকা চড়ক টাট্‌কাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরি, টিনের মুহুরি দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি কত্তে বসেচে, 'ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিংড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং' ঢাকের

ঘোল খাচ্চে, গোলাপী খিলির দোনা বিক্রি হচ্চে। একজন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে—মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখনো ছেড়ে, পা নেড়ে ঘুত্তে লাগ্‌লো। কেবল 'দে পাক দে পাক' শব্দ। কারু সর্বনাশ, কারু পৌষ মাস! একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরানো হচ্চে; হাজার লোকে মজা দেক্‌চেন!

পাঠক! চড়কের যথাকথঞ্চিৎ নক্‌শার সঙ্গে কলিকাতার বর্তমান সমাজের ইন্‌সাইট জান্‌লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে, 'শহর শিখাওয়ে কোতোয়ালী।'

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা

"And these what name or title e'er they bear,
I speak of all"

Beggars Bush.

সৌখীন চড়কপার্বণ শেষ হল বলেই যেন দুঃখে সজ্‌নে খাড়া ফেটে গেলেন। রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগলো। ঢাকীরা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ কল্লে। বাজারে দুধ সস্তা হল (এত দিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না), গন্ধবেনে ভালুকের রোঁ বেচতে বসে গেলেন। ছুতোরেরা গুলদার ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠের কুচো বাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্লে। জন্মফলারে যজমেনে বামুনেরা আদ্যশ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁক্‌তে লাগলেন—তাই দেখে গরমি আর থাক্‌তে পাল্লেন না, 'ঘরে আগুন' জলে ডোবা ও ওলাউঠো প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌লেন।

রাস্তার ধারের ফড়ের দোকান, পচা লিচু ও আঁবে ভরে গেল। কোথাও একটা কাঁটালের ভুত্‌রির উপর মাচি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো

আঁবের আঁটি ছড়ানো রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘষে ভেঁপু করে বাজাচ্চে। মধ্যে এক পশলা বিষ্টি হয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা কলারের পাতের মত ত্যাখাচ্চে,—কুঠিওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশ্যালয়ের বারান্দার নীচে আর রাস্তার ধারের বেনের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন,—আজ ছক্কর মহলে পোহাবারো!

কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, গ্যালব্যানিক শকের কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কর যেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই কল্‌কেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে—কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারেনি বলেই আমরা কখনো কখনো দেখতে পাই। 'চার আনা!' 'চার আনা!' 'লালদিকি।' 'তেরজুরী!' 'এসো গো বাবু ছোট আদালত!' বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন সুরে চিৎকার কচ্চে—নবব্ধাগমনের বউয়ের মত দুই এক কুঠিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আচেন—সঙ্গী জুটচে না। দুই একজন গবর্নমেণ্ট আপিসের কেরানী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কথাকথি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেচেন—গাড়োয়ানরা হাসি টিটকিরির সঙ্গে 'তবে ঝাঁকা মুটেও যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম নয়' কমপ্লিমেণ্ট দিচ্চে!

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতী বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্‌চেন। হেটো ব্যাপারীরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা শহর বড়ই গুল্‌জার—গাড়ির হর্‌রা, সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠ্‌চে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমথাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে
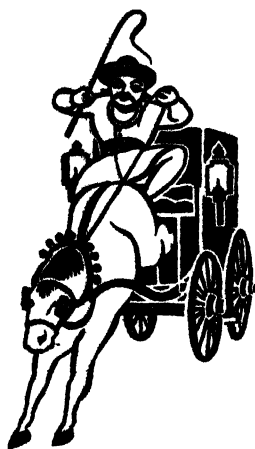
বারোইয়ারি পুজার বার্ষিক সাদ্‌তে বেরিয়েচেন। বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাটখোলায় গদি ; দশ-বারোটা খন্দ মালের আড়ৎ, বেলেঘাটায় কাটের ও চুনের পাঁচখান গোলা, নগদ দশ-বারো লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে। কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন দেন হয়ে থাকে, বারো মাস প্রায় শহরেই বাস, কেবল পুজোর সময় দশ-বারো দিনের জন্যে বাড়ি যেতে হয় ; একখানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি ষাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ-দেঁড়ে এক এক ভাউলে ব্যাভ্যার, আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির!

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোনার তাগা, কোমরে মোটা সোনার গোট, গলায় এক ছড়া সোনার দু-নর হার, আহ্নিকের সময় খেল্‌বার তাসের মত চ্যাটালো সোনার ইষ্টিকবচ পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কানে ফোঁটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাংলা ও ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দেরের আসা যাওয়ায়ও দু-চার ইংরাজি কোম্পানির কনট্র্যাক্টে ‘কম’ আইস, ‘গো’ যাও প্রভৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে, কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজকর্ম দেখতে হত না, কানাইধন দত্তই তাঁর সব কাজকর্ম দেখতেন, দাঁ মহাশয় টানা পাখায় বাতাস খেয়ে, বগি চড়ে, আর এসরাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বারোজনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পুজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি ‘মা’ ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পুজার প্রধান উত্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রি ও চালান হয়, মন পিছু এক কড়া, দু-কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জম্‌লে মহাজনদের মধ্যে বর্ধিষ্ণু ও ইয়ারগোচের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা

হয়, তিনি বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্যে ঘোড়া ও বারোইয়ারি সং ও রংতামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাদা ও আর আর কাজের ভার পেয়েছিলেন।

দত্ত বাবুর গাড়ি রুনু রুনু ছুনু ছুনু করে সুড়িঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের বাড়ির দরজায় লাগ্‌লো। দত্ত বাবু তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে দরওয়ানের কাছে উপস্থিত হলেন। শহরের বড় মানুষের বাড়ির দরওয়ানরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারৎ! 'হোরির বক্‌সিস্' 'দুর্গোৎসবের পার্বণী' 'রাখী পুর্ণিমার প্রণামী' দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্ত বাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবলে একজন দরওয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন। শহরের অনেক বড় মানুষের কাছে কর্জ দেওয়া টাকার সুদ বা তাঁর পৈতৃক জমিদারী কিন্‌তে গেলেও বাবুর কাছে এৎলা হলে, হুজুরের হুকুম হলে লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার! এতে বড় মানুষদেরও বড় দোষ নাই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উমেদার কন্যাদায় আইবুড়ো ও বিদেশী ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদের জ্বালায় শহরে বড় মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানির জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্ কল্লেও বিশ্বাস হয় না! দত্ত বাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হল তিনি কিসের জন্যে হুজুরে এসেচেন—ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরওয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তার চার আনা দাদুনে দরওয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে

তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে হুজুরে পেশ কল্লে।

পাঠক! বড় মানুষের বাড়ির দরওয়ানের কথায় এইখানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গেল, সেটি না বলেও থাকা যায় না।

বছর দশ-বারো হল, এই শহরের বাগবাজার অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নেমন্তন্ন করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়, আমরা পুরুষপরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে, প্রদীপ জ্বেলে, শাঁখ বাজিয়ে, আইবুড়ো ভাত খাবার মত—কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজকাল শহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতরগোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ ষেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন, অভিপ্রায় আপনারা আশীর্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরিব জামা ও হীরের কণ্ঠি পবে নাচ দেখ্‌তে বসুন,—প্রতিমে বিসর্জ্জন—স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নদের গা সারতে আপিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদেব বাগবাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যাননি, কেবল গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে ভালো করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এদিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুটলেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে দিন সকালে বাদলা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায়নি। বাঙালীদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্মকর্ত্তা মাছের জন্যে বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল

না—শেষ একজন জেলে একটা সের দশ-বারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হল। মাছ দেখে কর্মকর্তার খুশির আর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম বলবে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'বাপু, এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে।' জেলে বললে, 'মশাই! এর দাম বিশ ঘা জুতো!' কর্মকর্তা 'বিশ ঘা জুতো!' শুনে অবাক হয়ে রইলেন, মনে কল্লেন, জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয়তো পাগল, কিন্তু জেলে কোন ক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি নেবে না, এই তার পণ হল। নেমন্তন্নে বাড়ির কর্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মস্‌করা কত্তে লাগ্‌লো, কিন্তু কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচ্‌লো না। শেষে কর্মকর্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাত্তে রাজী হলেন, জেলেও অম্লান বদনে পিঠ পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিঠে পড়বামাত্র, জেলে 'মশাই! একটু থামুন, আমার একজন অংশীদার আছে, বাকি দশ ঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান, দরজায় বসে আছে, তারে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আস্‌ছিলাম, তখন মাছের আদ্দেক দাম না দিলে আমারে ঢুকতে দেবে না বলেছেল, সুতরাং আমিও আদ্দেক বক্‌রা দিতে রাজী হয়েছিলাম।' কর্মকর্তা তখন বুঝ্‌তে পাল্লেন, জেলে কি জন্যে মাছের দাম বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বক্‌রার জন্যে প্রতীক্ষে করে থাকতে হল না; কর্মকর্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন। পাঠক বড় মানুষেরা! এই উপন্যাসটি মনে রাখবেন।

হুজুর দেড় হাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস্ দিয়ে বসে আছেন, গা আদুড়! সাম্‌নে মুন্‌শী মশায় চশমা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছেন— সাম্‌নে কতকগুলো খোলা খাতা ও একঝুড়ি চোতা কাগজ, আর এক দিকে চার-পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে 'ক্ষণজন্মা' 'যোগভ্রষ্ট' বলে তুষ্ট করবার অবসর খুঁজছেন। গদির বিশ হাত অন্তরে দুজন বেকার 'উমেদার' ও একজন বৃদ্ধ 'কন্যাদায়' কাঁদ কাঁদ মুখ করে ঠিক 'বেকার' ও 'কন্যাদায়' হালতের পরিচয় দিচ্চেন। মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুরঘুর কচ্চেন, কেউ হুজুরের কানে কানে দু-চার কথা কচ্চেন—হুজুর ময়ূরহীন কার্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। দত্ত বাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হজুর বারোইয়ারি পুজোর বড় ভক্ত, পুজোর ক-দিন দিবারাত্রি বারোইয়ারি-তলাতেই কাটান, ভাগ্‌নে, মোসাহেব, জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্যে দিনরাত শশব্যস্ত থাকেন।

দত্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হজুরি সবিস্‌ক্রিপশন্‌ হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন, পেমেণ্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দু-টাকার হিসাবে দস্তুরি কেটে ন্যান, দত্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবেও দাওয়ানজীকে খুশি রাখ্‌বার জন্যে তাতে আর কথা কইলেন না। এদিকে বাবু বারোইয়ারি পুজোর ক-রাত্তির কোন্‌ কোন্‌ রকম পোশাক পরবেন, তারই বিবেচনায় বিব্রত হলেন।

কানাইবাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দুটো অবধি নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মস্ত টাকা সই মাত্র হল। (আদায় হবে না, তার ভয় নাই), কোথাও গলা ধাক্কা, তামাসা ও ঠোনাটা ঠানাটাও সইতে হল।

বিশ বচ্ছর পুর্বে কল্‌কেতার বারোইয়ারি চাঁদা-সাদারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা সাদার মত লোকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন—অনেকে চোটের কথা কয়ে বড় মানুষেদের তুষ্ট করে টাকা আদায় কত্তেন।

একবার এক দল বারোইয়ারি একচক্ষু কানা এক সোনারবেনের কাছে চাঁদা আদায় কত্তে যান। বেনেবাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, বাবার 'পরিবারকে' (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট বোধ কত্তেন, তামাক খাবার পাতের শুক্‌নো নলগুলি জমিয়ে রাখ্‌তেন, এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রি কত্তেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উসুল হত। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা বেনেবাবুর কাছে চাঁদার বই ধল্লে তিনি বড়ই রেগে উঠলেন ও কোন মতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কত্তে রাজী হলেন না, বারোইয়ারির

অধ্যক্ষেরা অনেকক্ষণ ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না—তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাক্স মধ্যে রাখা হয়—বালিশের ওয়াড়, ছেলেদের পোশাক, বেনেবাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন—চাকরদের কাছে (একজন বুড়ো উড়ে মাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দু-বার নিকেশ নেওয়া হয়—ধুতি পুরনো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন—বেনেবাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশ টাকা আসতো, কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কত্তেন না। (পৈতৃক পেশা) থাটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসার নির্বাহ হত; কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চশমায় দুখানি পরকোলা বসানো; তাই দেখে বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন, 'মশাই! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েছে, হয় চশমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।' বেনেবাবু এ কথায় খুশি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আর একবার একদল বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ শহরের সিঙ্গি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিঙ্গিবাবু সে সময় আপিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চার পাঁচজনে তাকে ঘিরে ধরে 'ধরেছি' বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তায় লোক জমে গেল। সিঙ্গিবাবু অবাক্—ব্যাপারখানা কি? তখন একজন অধ্যক্ষ বললেন, 'মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গার বারোইয়ারি পুজোয় মা ভগবতী সিঙ্গির উপর চড়ে কৈলাস থেকে আস্‌ছিলেন, পথে সিঙ্গির পা ভেঙে গ্যাছে; সুতরাং তিনি আর আস্‌তে পাচ্চেন না, সেইখানেই রয়েচেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েচেন যে, যদি আর কোন সিঙ্গির যোগাড় কত্তে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিঙ্গির দেখা পেলাম না; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না—চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্‌বির করবেন।' সিঙ্গিবাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা সাধার বিষয়ে নানা উদ্ভট কথা আচে, কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পুজো আর কোথাও হত না, 'আচাভো' 'বোম্বাচাক' প্রভৃতি সং প্রস্তুত হত; শহরেরও

নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজ্‌রা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখ্‌তে যেতেন ; লোকের এত জনতা হত যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিল, চোরেরা আণ্ডিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়েনি। গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে ক-বার বড় ধুম করে বারোইয়ারি পুজো হয়েছিল। এতে টক্কাটক্করিও বিলক্ষণ চলেছিল। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ

টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পুজো করেন ; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা 'মার' অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পুজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সে কাল নাই ; বাঙালী বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তাভস্মের চুন দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া শহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা হুজুর, উঁচুগতি কার্ত্তিকের মত বাউরি চুল, এক পাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিত বেশ্যা আর পাকানো কাছা—জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পোর মত 'কখনোর' পাল্লায় পড়েছে !

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড় মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না ; কেবল শহরে দু-চার বেনে বড় মানুষই মোসাহেব-দের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক ফোলানো, বাঁকা সিঁতি, পইতের গোচ্ছা গলায়, কুঁচের মত চক্ষু লাল, কানে তুলোয় করা আতর, (লেখা পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণপরিচয়টি হয় নাই) আমরা খালি সোনারবেনে বড় মানুষ বাবুদের মজলিসে দেখ্‌তে পাই।

মোসাহেবী পেশা উঠে গেলেই, 'বারোইয়ারি' 'খ্যামটা' 'চোহেল্‌' ও 'ফররার' লাঘব হবে সন্দেহ নাই !

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুধের হাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্চে। মেছুনীরে আপনাদের পাটা, বঁটি ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মই কাঁদে করে দৌড়ুচ্চে—থানার সাম্নে পাহারাওয়ালাদের প্যারেড (এঁরা লড়াই করবেন, কিন্তু মাতাল দেখে ভয় পান) হয়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেতো কেরানীরে ছুটি পেয়েচেন। আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম—অধ্যক্ষেরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারই নমুনো দেখাবেন; কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে; দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!

ফৌজদুরী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি বেল লাল্ঠন (রং বেরং—সাদা, গ্রীন, লাল) টাঙানো হয়েচে। উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা, তার উপর মাদ্রাজী খেরোর জাজিম হাস্‌চে। দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে, গনি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আশপাশ থেকে উকিঝুকি মাচ্চে—আজ তারা ঘরজামাই ও অন্নদাস ভাগ্‌নেদের দলে গণ্য!

বীরকৃষ্ণবাবু ধূপছায়া চেলীর জোড় ও কলার কপ ও প্লেটওয়ালা (ঝাড়ের গোলাপের মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন, রুমালটি কোমরে বাঁদা আছে—সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিশিয়েটিং হয়েচে!

পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো! বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হল। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্সী, ছিরে বেনে, ও পুঁটে তেলি রাজা হল। সেপাই পাহারা, আসা সোঁটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রবারের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত, রাস্তায় পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখ্‌ড়াই, ফুল আখ্‌ড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্ম গ্রহণ কল্লে। শহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠ্‌লেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো। এই সময়ে হাফ আখ্‌ড়াই ও ফুল আখ্‌ড়াই

সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি শহরের বড় মানুষরা হাফ আখড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগলেন। শ্যামবাজার, রামবাজার, চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্মা বাবুরো এক এক হাফ আখ্ড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্তগোছ হাড়হাবাতেরা সৌখীন দোহারের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ আখ্ড়াইয়ের পুণ্যে চারটি জুটে গেল। অনেকে পুঙ্গুরী দাদাঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়্লেন—কিছু দিনের মধ্যে তক্মা, বাগান, জুড়ি ও বালাখানা বনে গেল।

আমরা পুর্বে পাঠকদের যে বারোইয়ারি পুজোর কথা বলে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্তির বারোইয়ারিতলায় হাফ আখড়াই হবে, তার উজ্জুগ হচ্চে।

ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়িটিতে হাফ আখ্ড়াইয়ের দল বসেচে—বীরকৃষ্ণবাবু বগি চড়ে প্রত্যহ আড্ডায় এসে থাকেন—দোয়াররা কুঠি থেকে এসে হাত্ত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে রাত্তির দশটার পর একত্রে জমায়াত হন—ঢাকাই কামার, চাষা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোট বাবু অধ্যক্ষ। ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা! শরীর ডিগডিগে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালো ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। দেড় ভরি আফিম, দেড়শ ছিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ি রোজ্কী মৌতাতের উটুনো বন্দোবস্ত। পালপার্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায় চড়ান!

অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি—গুড় গুড় করে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নল্পাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়্চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন, আর হন্ হন্ করে চলেচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ কচ্চে—দোকানীরে ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে;—গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গেল। ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ বাবু, চক বাজারের প্যালানাথবাবু, দলপতি বাবুরো ও দু-চার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরাও আস্বেন। গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েচে—দোয়াররাও মিল ও তাল-দোরস্ত।

সময় কারুরই হাত ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত—বেশ্যার যৌবনের মত ও

জীবের পরমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা করে না। গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠ্‌লো—রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুষলের ধারে ভারী এক পশলা বিষ্টি এল।

এদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে অনেকে এসে জমতে লাগ্‌লেন। অনেকে সখের অনুরোধে ভিজে চ্যাপচ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দেয়ালগিরিতে বাতি জল্‌চে—মজলিস জক্ জক্ কচ্চে—পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থেলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুয্যেদের ছোট বাবু লোকের খাতির কচ্চেন—'ওরে' 'ওরে' করে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাষা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফিনি, মেটো ঘণ্টো ও আটা নেব্‌ড়ানো লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিটু হয়ে বসে আছেন—অনেকের চক্ষু বুজে এসেচে—বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখ্‌চেন ও এক একবার ঝিমকিনি ভাঙলে মনে কচ্চেন যেন উড়্‌চি! ঘরটি লোকারণ্য—থাতায় থাতায় ঘিরে বসে আচেন—থেকে থেকে ফক্কুড়িটে টপ্পাটা চল্‌চে--অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতোজোড়াটি হয় পকেটে নয় পা-র নীচে রেখে চেপে বসেচেন—জুতো এমন জিনিস যে, দোয়ার দলের পরস্পরে বিশ্বাস নাই। চকবাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্ধ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু-একজন ধর্‌তা দোয়ার প্যালানাথবাবুর আস্‌বার অপেক্ষায় থাক্‌তে বেজার হচ্চেন—দু-একজন 'তাই তো' বলে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন; কিন্তু প্যালানাথবাবু বারোইয়ারির একজন প্রধান ম্যানেজার, সৌখীন ও খোস-পোশাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! সুতরাং কিছুক্ষণ তাঁর অপেক্ষা না করলে তাঁরে অপমান করা হয়—ঝড়ই হোক, বজ্রাঘাতই হোক, আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁর এসব বিষয়ে এমনি সখ যে, তিনি অবশ্যই আসবেন! ধর্‌তা দোয়ার গোবিন্দবাবু বিরক্ত হয়ে নাকী সুরে 'মনালে বঁদিয়া' জিকুর টপ্পা ধরেচেন—গাঁজার হুঁকো একবার এ থাকের পাশ মেরে ও থাকে গেল।

ঘরের এক কোণে হুঁকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায় সে দিকের থাকেরা রুল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়চেন ও কেমন করে পড়লো প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন—এমন সময়

একখান গাড়ি গড়্ গড়্ করে এসে দরজায় লাগ্‌লো। মুখুয্যেদের ছোট বাবু

মজলিস থেকে তড়াক্ করে লাপিয়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে 'প্যালানাথবাবু! প্যালানাথবাবু এলেন' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—দোয়ার দলে হুর্‌রে ও রৈ রৈ পড়ে গেল—ঢোলে রং বেজে উঠ্‌লো। প্যালানাথবাবু উপরে এলেন—শেকহ্যাণ্ড, গুড্‌ইভনিং ও নমস্কারের ভিড় চুক্‌তে আধ ঘণ্টা লাগ্‌লো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ, গত বৎসর পঞ্চাশ পেরিয়েছেন; বাবু বড় হিন্দু—একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস ও উত্থান ও শয়নে নির্জ্জলা করে থাকেন, বাবুর মেজাজ গরীব! সৌখিনের রাজা! ১২১৯ সালে সারবর্‌ন্ সাহেবের নিকটে তিন মাস মাত্র ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছিলেন, সেই সম্বলেই এত দিন চল্‌চে—সর্বদা পোশাক ও টুপি পরে থাকেন; (টুপিটি এমনি হেলিয়ে হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কান আছে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) লখ্‌নৌ ফ্যাশানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনমত পোশাক। প্যালানাথবাবুর বাই ও খ্যাম্‌টা মহলে বড় মান! তাদের কোন দায় দফা পড়্‌লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন ও বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানি মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা দেন ও বারোইম্মারের নামে তসবি পড়েন! মোসলমান মহলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি! অনেক লখ্‌নৌয়ে পাত্তি ও ইরানী চাঁপদাড়ি বাবুর বুজরুকি ও কেরামতের অনিয়ত এনসাফ করে থাকেন! ইংরিজি কেতা বাবুর ভালো লাগে না; মনে করেন ইংরিজি লেখাপড়া শেখা স্রেফ্ কাজ চালাবার জন্যে। মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবা রাত্তির থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পছন্দ! সর্বদাই নবাবী আমলের জাঁকজমক, নবাবী আমিরী ও নবাবী মেজাজের

কথা নিয়ে নাড়াচাড়া হয়।

এদিকে দোয়াররা নতুন সুরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন্‌রন্‌ কত্তে লাগলো—ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চম্‌কে উঠ্‌লো—কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠ্‌লো—বোধ হতে লাগ্‌লো যেন হাড়ীরে গোটাকতক শুয়ার ঠেঙিয়ে মারচে! গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুশি হয়ে সাবাস! বাহবা! ও শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন—দোয়াররা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগ্‌লো, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে ধোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, গাওনার বেতরো আওয়াজে চম্‌কে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়লো! রাত্তির দুটো পর্যন্ত গাওনা হয়ে শেষে সে রাত্তিরের মত বেদব্যাস বিশ্রাম পেলেন—দোয়ার, সৌখীন বাবু ও অধ্যক্ষরা অন্ধকারে অতি কষ্টে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আড় হলেন!

এদিকে বারোইয়ারিতলায় সং গড়া শেষ হয়েচে। এক মাস মহাভারতের কথা হচ্ছিল, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপর বসে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুতঃ যা বল্‌চেন, সকলি কাশীরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা স্বপাক। কথকতা পেশাটা ভালো—দিব্য জলখাবার, দিব্য হাতপাখার বাতাস, কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার বিহারের আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান্‌ কষ্ট। পূর্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; শ্রীধর অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা, চাণক্যশ্লোকের দু-আখর পাঠ, কীর্তন অঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্থ করেই মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন। কথা শোনবার ও সং ভাখ্‌বার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে—কুমোর, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষরা থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছি চেঁচিয়ে গলা ভাঙচেন! বাজে লোকের মধ্যে দু-একজন আপনার আপনার কর্তৃত্ব ভাখাবার জন্যে 'তফাৎ তফাৎ' কচ্চে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়েমানুষ দেখে সঙের তরজমা করে বোঝাচ্চেন। সংগুলি বর্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্ম গ্রহণ করা ভার!

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন—অর্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর

জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জাতির পরাক্রম দেখে দুর্যোধন ক্যাল্ ক্যাল্ করে চেয়ে রয়েচেন। সঙেদের মুখের ছাঁচ ও পোশাক সকলেরই একরকম, কেবল ভীম ভূদের মত সাদা, অর্জুন ডেমার্টিনের মত কালো ও দুর্যোধন গ্রীন!

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিমের দালালের মত পোশাক পরে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পর বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকি; হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন এক দল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ি ঢোক্‌বার জন্যে দরওয়ানের উপাসনা কচ্চে!

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে—শ্রীমন্তের মাথায় শালের শামলা হাফ ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা; ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্লিডার প্লিড কচ্চেন!

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে—দেশ দেশান্তরের রাজারা চারিদিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোশাক ও চেহারা দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয় যেন এক দল দরওয়ান স্তাকরার দোকানে পাহারা দিচ্চে!

কোনখানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাম্বুবান্, হনুমান্ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা শহুরে মুচ্ছুদ্দী বাবুদের মত পোশাক পরে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন—রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী; সীতের ট্যাড়চা শাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে।

'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন' সং বড় চমৎকার!—বাবুর ট্যাস্‌ল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ড্‌চেন অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসির বাড়ি অন্ন লুসেন, ঠাকুরবাড়ি শোন, আর সেনেদের বাড়ি বস্‌বার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফর্মেশনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ)। পুলিস, বড় আদালত, টাউনহল নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রাহ্মসভায় মিটিং ও ক্লাবে হাঁফ ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরি, দালালি, খোসামুদি ও ঠিকে রাইটরি করে

যা পান, ট্যাস্‌লওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুশেই সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুলমাস্টারি কখনো কখনো স্বীকার কত্তে হয়।

কোথাও 'অসৈরণ সৈতে নারি শিকেয় বসে ঝুলে মরি' সং—অসৈরণ সইতে নারি মহাশয়, ইয়ং বাঙালীদের টেবিলে খাওয়া, পেণ্টুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতী কোট্ চাপকান পরা! (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চশমা! রাত্তিরে খানায় পড়ে ছুঁচো ধরে খান! দিনের ব্যালা রিফর্মেশনের স্পিচ্ করেন দেখে—শিকেয় ঝুলচেন।

এ সওয়ায় বারোইয়ারিতলায় 'ভালো কত্তে পারবো না মন্দ করবো কি দিবি তা দে', 'বুক ফেটে দরোজা' 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে' 'ধ্যাদা পুতের নাম পদ্মলোচন' 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' 'হাড় হাবাতে মিছরির ছুরি' প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েচে; সে সব আর এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের দু-পাশে 'বকা ধার্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবে'র সং বড় চমৎকার হয়েচে। বকা ধার্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত নাদুর নুদুর—ভুঁড়িটি বিলাতী কুমড়োর মত—মাতায় কামানো চৈতনফক্কা ঝুঁটি করে বাঁদা—গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটিকতক সোনার মাদুলি—হাতে ইষ্টিকবচ—চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া—কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ—গত বৎসর আশি পেরিয়েচেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে! গেরস্তগোচের ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্চেন—হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন। ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্ছে।

ক্ষুদ্র নবাব—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে—দুদে আলতার মত রং—আলবার্ট ফ্যাশানে চুল ফেরানো—চীনের শুয়ারের মত শরীরটি ঘাড়ে গদ্দানে—হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—সিমলের ফিনফিনে ধুতি মালকোঁচা করে পরা, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরবে 'হিদে জোলার নাতি'।

বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু—ঘোড়ার চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো—মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্তি—সিঙ্গির গা রুপোলী গিল্‌টি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকরুণের বিবিয়ানা মুখ—রং ও গড়ন আসল ইহুদী ও

আরমানী কেঁস্তা ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিঙ্গিওয়ালা কুইনের ইউনিকর্ন্ ও ক্রেস্ট !

আজ বারোইয়ারির প্রথম পুজো শনিবার—বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাই দত্ত, প্যালানাথ

বাবু ও বীরকৃষ্ণবাবুর ফ্রেণ্ড আহিরীটোলার রাধামাধব বাবুরো ব্যালা তিনটে পর্যন্ত বারোইয়ারিতলায় হাযরাও হয়েছিলেন—তিনটে বড় বড় অর্ণা মোষ, এক শো ভেড়া ও তিন শো পাঁটা বলিদান করা হয়েচে—মূল নৈবিদ্যির আগা তোলা মোণ্ডাটি ওজনে দেড় মন। শহরের রাজা, সিঙ্গি, ঘোষ, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড় বড় দলস্থ ফোঁটা, চেলীর জোড়, টিকি ও তেলকধারী উর্দি ও তক্‌মাওয়ালা যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয় হয়েচে—'সুপারিস' 'অনাহুতে' 'বেদলে' ও 'ফলারেরা' নিমতলার শকুনির মত টেঁকে বসে আছেন—কাঙালী, রেও, অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমেছিল—পাহারা-ওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন—অনেক গরীব গ্রেপ্তার হয়! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে থানার দারোগা ও জমাদারের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সে বারের মত রেহাই পায় !

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল—বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য। শহরের অনেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখ্‌তে এসেচেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখ্‌চে। ক্রমে মজলিসে দু-এক ঝাড় জেলে দেওয়া হল—সঙেদের মাথার উপর বেল ল্যাণ্ঠন বাহার দিতে লাগ্‌লো। অধ্যক্ষ বাবুরা একে একে জমায়াত হতে লাগ্‌লেন, নল করা খেলো হুঁকো হাতে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চিৎকার ও 'এটা কর' 'ওটা কর' করে হুকুম দিচ্চেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে। দেড় মন গাঁজা, দুই মন চরস, বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেনের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কর্পুর, দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে—মিটে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানী

তামাকের গোবর্ধন হয়েচে! এ সওয়ায় বিস্তর অস্তঃশিলে-সরঞ্জামও প্রস্তুত আছে। আবশুক হলে দেখা দেবে!

শহরে টি টি পড়ে গ্যাচে আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় হাফ আখড়াই হবে। কি ইয়ার গোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো! কোঁচানো ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনির এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো। চারপুরুষে পাঁচপুরুষে ক্রেপ্ ও নেটের চাদরেরা অকর্মণ্য হয়ে নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করেছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুন্সি ও চাবির শিকলি হঠাৎ বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে, ঘড়ির চেনের অফিশিয়েটিং হল—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।

বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো—এক দিকে কাঠগড়া ঘেরা মাটির সং—অন্যদিকে নানা রকম পোশাক পরা কাটগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড়মানুষরা ট্যাস্‌লওয়ালা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইষ্টিকে চালচিত্রের অসুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চেন। প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণবাবু লকাই লাট্টুর (লাটিম) মত ঘুরে বেড়াচ্চেন, দু-কশ দিয়ে পাঁজির ছবির রক্তদন্তী রাক্ষসীর মত পানের পিক্ গড়িয়ে পড়চে—চাকর, হরকরা, সরকার, কেরানী ও ম্যানেজারদের নিশ্বেস ফ্যাল্‌বার অবকাশ নাই।

ঢং ঢং করে গির্জের ঘড়িতে রাত্তির দুটো বেজে গেল। ধোপাপাড়ার দল ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসরে নাব্‌লেন। অনেকে আখড়া ঘরে (সাজঘরে) শুয়ে পড়লেন। বাঙালীর স্বভাবই এই, পরের জিনিস পাতে পড়্‌লে শীগ্‌গির হাত বন্ধ হয় না (পেট সেটি বোঝে না বড় দুঃখের বিষয়!) দেড় ঘণ্টা ঢোল, বেহালা, ফ্লুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজ্‌লো—গোঁড়ারা দুশো বাহবা ও বেশ দিলেন—শেষে একটি ঠাকরুণবিষয় গেয়ে (আমরা গানটি বুঝ্‌তে অনেক চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য হতে পাল্লেম না) উঠে গেলে চকের দল আসরে নাব্‌লেন।

চকের দলেরাও ঐ রকম করে গেয়ে শোভান্তরী! সাবাস! ও বাহবা! নিয়ে উঠে গেলেন—এক ঘণ্টার জন্যে মজলিস খালি রইলো; চায়নাকোট, ক্রেপের, লেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যারচা চাদরেরা—পিঁপড়ের ভাঙা সারের

মত ছড়িয়ে পড়্লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গেল। চুরোট, তামাক ও চরসের ধুঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠ্লো যে, সে বারে 'প্রোক্লেমেশনের উপলক্ষে বাজিতে' বা কি ধোঁ হয়েছিল! বড় বড় রিভিউয়ের তোপেও তত ধোঁ জন্মে না। আদ ঘণ্টা প্রতিমেখানি দেখা যায়নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিল।

ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াশার মত ও শরতের মেঘের মত ধোঁ দেখ্তে দেখ্তে পরিষ্কার হয়ে গেল! দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গেলেন। চকবাজারেরা নাব্লেন ও ধোপা-পুকুরের দলের বিরহের উতোর দিলেন। গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোল্জারদের মত দল বেঁধে দু-থাক হল। মধ্যস্থরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন—এক দলে মিস্তির খুড়ো আর এক দলে দাদাঠাকুর বাঁদন্দার। বিরহের পর চাপা কাঁচা খেঁউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচার ও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারিও বাকি থাক্‌বে না।

তোপ পড়ে গিয়েচে, পূর্বদিক্ ফরসা হয়েচে, ফুর্‌ফুরে হাওয়া উঠেচে—ধোপা-পুকুরের দলেরা আসর নিয়ে খেঁউড় ধল্লেন, গোঁড়াদের 'সাবাস'! 'বাহবা'! 'শোভাস্তরী'! 'জিতা রও'! দিতে দিতে গলা চিরে গেল; এরই তামাসা দেখ্‌তে যেন সূর্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন! বাঙালীরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন! কুমুদিনী মাতা হেঁট কল্লেন! পাখীরা ছি! ছি! ছি! করে চেঁচিয়ে উঠ্লো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাস্‌তে লাগলেন! ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন, সুতরাং চকের দলকে তার উতোর দিতে হবে। ধোপাপুকুরওয়ালারা দেড় ঘণ্টা প্রাণপণে চেঁচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে থাম্‌লে চকের দলেরা আসরে নাব্লেন, সাজ বাজ্‌তে লাগলো, ওদিকে আখড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে, আধ ঘণ্টার মধ্যে উতোরের চোতা মজলিসে দেখা দিলেন—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে 'আমাদের জিত!' 'আমাদের জিত!' করে চেঁচামেঁচি কত্তে লাগ্লেন—(হাতাহাতিও বাকি রইলো না) এদিকে মধ্যস্থরাও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও! হো! হো! হুর্‌রে ও হাততালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গেলেন—

নেশার খোয়ারি—রাত জাগ্‌বার ক্লেশ ও হারের লজ্জায়—মুখুয্যেদের ছোট বাবু ও দু-চার ধর্‌তা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়্‌লেন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু শুধু পা—মোজা পায়; জুতো কোথায় তার খোঁজ নাই। গোঁড়ারা আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চললেন—ব্যালা দশটা বেজে গেল, দর্শকরা হাফ আখড়াইয়ের মজা ভরপুর লুটে বাড়িতে এসে স্নত্‌ ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি চাদর জামা ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার আপনার মনিববাড়ি ফিরে গেল!

আজ রবিবার। বারোইয়ারিতলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জম্‌লেন; এখনো অনেকের 'চোঁয়া ঢেঁকুর' 'মাতা ধরা' 'গা মাটি মাটি' সারেনি। পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে—প্রথম দল গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আখড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ, সুতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গেল।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাবরি চুল, উল্কী ও কানে মাকৃড়ি! অধিকারী দূতী সেজে গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন তার পর বাসদেব ও মণিগোঁসাই গান করে গেলেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত 'কাল জল খাবো না!' 'কাল মেঘ দেখবো না!' (সামিয়ানা খাটাইয়ে দিমু) 'কাল কাপড় পরবো না!' ইত্যাদি কথাবার্তায় ও 'নবীন বিদেশিনীর' গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরানো বনাত ও শালের গাদি হয়ে গেল। টাকা, আদুলি, সিকি ও পয়সা পর্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে 'বাবা দে আমার বিয়ে' ও 'আমার নাম সুন্দুরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে' প্রভৃতি রকমওয়ারি সঙেরও অভাব ছিল না। ব্যালা আটটার সময় যাত্রা ভাঙলো, একজন বাবু মাতাল পাত্র টেনে বিলক্ষণ প্যোঁকে যাত্রা শুনছিলেন, যাত্রা ভেঙে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গেলেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী-মূর্তি) কিন্তু প্রতিমার সিঙ্গি হাতীকে কামড়াচ্চে দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হল ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণার সুরে—

'তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি।
মানুষ মলে টেড্‌টা পেতে তোমায় যেতে হত হরিণবাড়ি।
সুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগড়ি।
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় গ্র্যান্‌যুড়ি।
সিদ্ধি মামা টেবূটা পেতেন ছুটতে হত উকিলবাড়ি॥'

গান গেয়ে, প্রণাম করে চলে গেলেন।

শহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড় ইতরবিশেষ নাই ; মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালার বাপ গোবরা প্রায় এক মূর্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ধরে রাখবার লোক নাই বলেই আমরা নর্দমায়, রাস্তায়, থানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখতে পাই। শহরে বড়মানুষ মাতালও কম নাই, সুদ্ধ ঘরে ধরে পুরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে, অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙালী বড়মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোটলোক মাতালের ভাগ্যে চারি আনা জরিমানা,—এক রাত্তির গারদে বাস—পাহারাওলাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কোঁৎকা মাত্র, কিন্তু বাঙালী বড়মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। পাকি হয়ে উড়তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা, প্রতিমের নকল সিদ্ধি ভেঙে ফেলে আসল সিদ্ধি হয়ে বসা, ঢাকীরে মার সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া, ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট, ফোর্ট, রেলওয়ে, এস্টেশন্ ও অক্‌সনে মদ খেয়ে মাতলামি করে চালান হওয়া। এ সওয়ায় করুণা, গান, বক্‌সিস ও বক্তৃতার বেহদ্দ ব্যাপার। একবার শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড়মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাড়ির মেজো বাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুন্‌তে বসেচেন ; সামনে মালিনী ও বিদ্যে 'মদন আগুন জ্বলচে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী' গান করে মুটো মুটো প্যালা পাচ্চে—বছর যোল বয়সের দুটো (স্টকব্রেড) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খ্যাম্‌টা নাচ্চে। মজলিসে রূপোর গ্ল্যাসে ব্রাণ্ডি চল্‌চে—বাড়ির টিক্‌টিকি ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও ভোঁ! ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রানীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়লো ; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে—মালিনী বাবুদের 'দোহাই' দিয়ে কেঁদে বাড়ি সরগরম করে

তুললে—বাবুর চটকা ভেঙে গেল ; দেখ্‌লেন কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন 'কোন্ বেটার সাধ্যি আমার কাছ থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়' এই বলে সাম্‌নের রুপোর গেলাসটি কোটালের রগ তোগে ছুঁড়ে মাল্লেন—গেলাসটি কোটালের রগে লাগ্‌বামাত্র কোটাল 'বাপ'! বলে অমনি ঘুরে পড়্‌লো, চারিদিক থেকে লোকেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল—মুকে জলের ছিটে মারা হল ও অন্য অন্য নানা তদ্‌বির হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না—কোটালের পো এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন।

আর একবার ঠন্‌ঠনের 'র' ঘোষজা বাবুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেঁ্যকে মজলিসে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুন্‌ছিলেন। সমস্ত রাত বেহুঁশেই কেটে গেল, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ মশানে কোটালের হাঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হল—কিন্তু আসরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে 'কেষ্ট ল্যাও, কেষ্ট ল্যাও' বলে ক্ষেপে উঠলেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝালেন যে, 'ধর্ম অবতার! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই' কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না (কৃষ্ণ তাঁরে নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

আর একবার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন, সেটিও না বলে থাকা গেল না। পুর্বে এই শহরে বেনেটোলার স্বিপ্‌চাঁদ গোস্বামীর অনেকগুলি বড়মানুষ শিষ্য ছিল। বাবু সিমলের বোস্‌বাবুরা প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। একদিন আমতার রামহরিবাবু বোস্‌জা বাবুরে এক পত্র লিখলেন যে, 'ভেক নিতে তাঁর বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটিকতক প্রশ্ন আছে, সেগুলি যত দিন পুরণ না হচ্ছে, তত দিন শাক্তই থাক্‌বেন।' বোসজা মহাশয় পরম বৈষ্ণব; রামহরিবাবুর পত্র পেয়ে বড় খুশি হলেন ও বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পুরণ করবার জন্যে প্রভু নদেরচাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরিবাবুর সোনাগাজীতে বাসা। দু-চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে ; সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন—সকালে বাড়ি আসেন, মদও বিলক্ষণ চলে, দু-চার নিমগোচের দাঙ্গার দরুন পুলিসেও দুই এক মোছলেকা হয়ে গিয়েচে। সন্ধ্যার পর সোনাগাজীর বড় জাঁক, প্রতি ঘরে ধুনোর ধোঁ,

শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুন হিন্দুধর্ম যেন মূর্তিমন্ত হয়ে সোনাগাজী পবিত্র করেন। নন্দেরচাঁদ গোস্বামী বোস্‌বাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোনা-গাজী ঢুক্‌লেন। গোস্বামীর শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত চৈতনফক্কা। সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা, নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপালে) এক ধ্যাবড়া চন্দন, হঠাৎ বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে! গোস্বামীর কল্‌কেতায় জন্ম, কিন্তু কখনও সোনাগাজীতে ঢোকেন নাই (শহরের অনেক বেশ্যা সিমুলের মা গোঁসাইয়ের জুরিস্‌ডিক্সনের ভেঁতর)। গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরিবাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরিবাবু কুঠি থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপী রকম নেশায় তর্‌ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গেতে 'অব্‌ হজরত যাতে লণ্ডন কো' গাচ্চেন, আর একজন মাতায় চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জুক কচ্চেন; এমন সময় বোস্‌ বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমন আমোদের সময় একটা ত্রকদ গোঁসাইকে দেখলে কার না রাগ হয়? সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠলেন, বোস্‌জার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার হতে পরিত্রাণ পান।

রামহরিবাবু বোসজার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহেবদের সঙ্গে চোক টেপাটেপি হয়ে গেল। একজন দৌড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলেন। এদিকে গাওয়া ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্যে পোস্টপন্‌ হল—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগলো।

গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে নানাপ্রকার শিষ্টাচারী কল্লেন; রামহরিবাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা করেছিলেন।

রামহরিবাবু গোস্বামীকে বললে, 'প্রভু! বোষ্টুম তন্ত্রের কটি বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে, আপনাকে মীমাংসা করে দিতে হবে; প্রথম, কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী-সম্পর্ক, তবে ক্যামন করে কেষ্ট রাধারে গ্রহণ কল্লেন?'

দ্বিতীয়, 'একজন মানুষ (ভালো, দেবতাই হল) যে ষোল শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এ বা কি কথা?'

তৃতীয়, 'শুনেচি কেষ্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মটন চাপ্ খেতে দোষ কি? আর বোষ্টুমদের মদ খেতে বিধি আছে; দেখুন বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কৃষ্ণও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।' প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চম্‌কে গেল, পালাবার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; এদিকে বাবুর দলে মুচ্‌কে হাসি, ইশারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চল্‌তে লাগ্‌লো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে একজন মোসাহেব বলে উঠ্‌লো, 'হুজুর! কালীই বড়; দেখুন—কালীতে ও কেষ্টতে ক-পুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে কার্তিক—তার বাহন ময়ুর—ময়ুরের যে ল্যাজ—তাই কেষ্টোর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়।' এ কথায় হাসির তুফান উঠ্‌লো। গোস্বামী নিজ স্বভাবগুণে গোঁয়ারৃতিমোয় গরম হয়ে পিট্টানের পথ দেখ্‌বেন কি, এমন সময় একজন মোসাহেব গোস্বামীর গায়ে টলে পড়ে তিলক ও টিপ জিব দিয়ে চেটে ফেল্লে, আর একজন 'কি করো! কি করো!' বলে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দেখে জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে চোঁচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন! রামহরিবাবু ও মোসাহেব-দের খুশির সীমা রইলো না। অনেক বড়মানুষে এই রকম আমোদ বড় ভালবাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা হয়।

কল্‌কেতা শহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা যায়; সকলগুলি সৃষ্টিছাড়া ও অদ্ভুত! চোরবাগানে দনুকর্ণ মিত্তিরবাবুর বাপ, স্মাট ড্রাইব মন্‌কিসন্ কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছুদী ছিলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যবসা কত্তেন! দনুবাবু কালেজে পড়েন, একজামিন্ পাশ করেচেন, লেক্‌চার শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন। শহরের বাঙালী বড়মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনায় গাধার বেহদ্দ ও বুদ্ধি এমনি সূক্ষ্ম যে, নেই বললেও বলা যায়, লেখাপড়া শিখতে আদবে

ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়ায়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ-মার ভয়ে শুধুদগেলাগোছ। সুতরাং এক্জামিন্ পাশ করবার পূর্বে দন্থকর্ণবাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও প্রথম মেয়েটির বিবাহ পর্যন্ত হয়ে গিছ্‌লো। দন্থ বাবুর দু-চার স্কুলফ্রেণ্ড সর্বদা আস্‌তেন যেতেন, কখনো কখনো লুকিয়ে চুরিয়ে —চরসটা, মাজমের বরপীখানা, সিদ্ধিটে আস্‌টাও চল্‌তো; ইচ্ছেখানা, এক আধ দিন শেরিটে, শ্যামপিনটারও আস্বাদ নেওয়া হয়, কিন্তু কর্তা স্বকলমে রোজগার করে বড়মানুষ হয়েছেন, সুতরাং সকল দিকে চোক রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্বদা ভাইস করে থাকেন, সেই দবদবাতেই ব্যাঘাত পড়েছিল!

সমরভেকেশনে কালেজ বন্দ হয়েচে—স্কুলমাস্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ ধরে ও বাজার করে বেড়াচ্চেন। পণ্ডিতেরা দেশে গিয়ে লাঙল ধরে চাষবাস আরম্ভ করেচেন (ইংরাজি স্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়)। দন্থবাবু সন্ধ্যার পর দুই-চার স্কুলফ্রেণ্ড নিয়ে পড়বার ঘরে বসে আছেন; এমন সময় কালেজের প্যারীবাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা শেরি নিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। প্যারীবাবু ঘরে ঢোক্‌বামাত্রই চারদিকের দোর, জান্‌লা বন্দ হয়ে গেল; প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেড়ালে চুরি করে দুদ খাবার মত করে) অত্যন্ত সাবধানে চল্‌তে লাগ্‌লো—ক্রমে ব্রাণ্ডি অন্তর্ধান হলেন। এদিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠ্‌লো; দোর, জানলা খুলে দেওয়া হল; চেঁচিয়ে হাসি ও গর্‌রা চল্‌তে লাগ্‌লো। শেষে শেরিও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরাজি ইস্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চললো,—ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। এদিকে দন্থবাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোচ্ছিলেন, ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চিৎকার ও রৈ রৈ শুনে গিয়ে দেখলেন বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চিৎকার ও হৈ হৈঁ কচ্চেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দন্থবাবুকে যাচ্ছেতাই বলে গালমন্দ দিতে লাগ্‌লেন। কর্তার গালাগালে একজন ফ্রেণ্ড বড়ই চটে উঠলেন ও দন্থ তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্তাকে একটা ঘুষি মাল্লেন। কর্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষতঃ ঘুষোটি ইয়ংবেঙ্গালী (বাঁদুরের ঝাড়া), ঘুষি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন। বাড়ির অন্ত অন্ত পরিবারেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে পড়লো, গিন্নী বাড়ির ভিতর থেকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগ্‌লেন। তিরস্কার, কান্না ও

গোলযোগের অবকাশে ক্রেওয়া পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এদিকে বাবুর কন্যা উপস্থিত হল ও মার কাছে গিয়ে বললেন, 'মা, বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক্! তোমার ভয় কি! ও ওল্ড ফুল মরে যাক্ না কেন, ওকে আমরা চাইনি; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে বঁসে হেল্‌থ [ড্রিঙ্ক] করবো, ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক্, আমি কোয়াইট রিফর্মড বাবা চাই!'

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রীমকোর্টের মিস্তুয়ার্স, থিক্ রোগ এণ্ড পিক্-পকেট উকিল সাহেবদের আপিসের খাতাঞ্জী। আপিসের ফেরতা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও দু-ধারি দোকানও ফাঁক যাচ্ছে না—পাগড়িটে এলিয়ে পড়েছে, ধুতি খুলে ছতুলি কুতুলি পাকিয়ে গ্যাচে, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে জোড়াসাঁকোর হাঁড়িহাটায় এসে একেবারে এড়িয়ে পড়্‌লেন, পা যেন খোঁটা হয়ে পড়ে গেল; শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন! ঠাকুর বাবুদের বাড়ির একজন চাকর সেই সময় মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল। রামবাবু তাকে দেখে 'আরে ব্যাটা মাতাল' বলে টলে সরে দাঁড়ালেন। চাকর মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'তুই শালা কে রে আমায় মাতাল বললি!' রামবাবু বললে, 'আমি রাম!' চাকর বললে, 'আমি তবে রাবণ!' রামবাবু—'তবে যুদ্ধং দেহি' বলে যেমন তারে মাস্তে যাবেন, অমনি নেশার ঝোঁকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপর চড়ে বস্‌লো। থানার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন। চাকর মাতাল কিছু ঠিক ছিল, পুলিসের সার্জন দেখে তাঁরে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কল্লে। রামবাবুও সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'ছি বাবা, এখন রামের হনুমান্‌কে দেখে ভয়ে পালালে! ছিঃ!'

রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল, আজ সোমবার—শেষ পুজোর আমোদ, চোহেল ও ফর্‌রার শেষ, আজ বাই, খ্যাম্‌টা, কবি ও কেত্তন।

বাইনাচের মজলিস চুড়োন্ত সাজানো হয়েচে, গোপাল মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজক্ষরের কুকুরের বের মজলিস এর কাছে কোথায় লাগে? চক্‌বাজারের প্যালানাথবাবু বাই মহলের ডাইরেক্টরী, সুতরাং বাই ও খ্যাম্‌টা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। শহরের নন্নী, ছন্নী, মুন্নী, খন্নী ও সন্নী প্রভৃতি ডিগ্রী, মেডেল ও সার্টিফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা ও

গোলাপ, শ্যাম, বিদু, খুদু, মণি ও চুণী প্রভৃতি খ্যামটাওয়ালীরা নিজ নিজ

তোবড়া তুব্ড়ি সঙ্গে করে আস্তে লাগ্লেন—প্যালানাথবাবু সকলকে মা গোঁসাইয়ের মত সমাদরে রিসিভ্ কচ্চেন—তাঁদেরও গরবে মাটিতে পা পড়চে না।

প্যালানাথবাবুর হীরের ওয়াচ গার্ডে ঝোলানো আধুলির মত মেকাবী হন্টিঙের কাঁটা নটা পেরিয়েচে। মজলিসে বাতির আলো শরতের জ্যোৎস্নাকেও ঠাট্টা কচ্চে, সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া ও তবলার মন্দিরের রুনুঝুনু তালে 'আরে সাঁইয়া মোরারে তেরি মেরো জানিয়ে' গানের সঙ্গে এক তায়ফা মজলিস রেখেচে। ছোট ছোট 'ট্যাস্ল' 'হামামা' ও 'তাজিরা' এ কোণ থেকে ও কোণ, এ চৌকি থেকে ও চৌকি করে ব্যাড়াচ্চেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা)

এমন সময় একখানা চেরেট গুড় গুড় করে বারোইয়ারিতলায় 'গড্ সেভ দি কুইন' লেখা গেটের কাছে থাম্লো। প্যালানাথবাবু দৌড়ে গেলেন—গাড়ি থেকে জরি ও কিংখাপ মোড়া জরির জুতোসুদ্ধ একটা দশমুনী তেলের কুপো ও এক কুটে মোসাহেব নাবলেন, কুপোর গলায় শিকলের মত মোটা চেন ও আঙুলে আঠারোটা করে ছত্রিশটা আংটি।
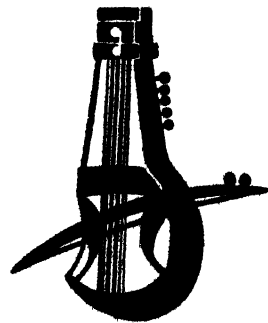
প্যালানাথবাবুর একজন মোসাহেব 'বড়বাজারের পচ্চু বাবু তুলোর ও পিস্-

গুড়ের দালাল, বিস্তর টাকা! বেশ লোক' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। পচ্চু বাবু মজলিসে ঢুকে মজলিসের বড় প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলি হল, শেষে পচ্চু বাবু প্রতিমে ও মাতালো মাতালো সঙেদের (যথা কেষ্ট, বলরাম, হনুমান্ প্রভৃতি) ভক্তিভরে প্রণাম কল্লেন ও বাইজীকে সেলাম করে দুখানি আমেরিকান চৌকি জুড়ে বস্‌লেন। দুটি হাত, এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির থেলো ও রুমালের জন্যে আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে আর দুখানি চৌকি ইজারা নেওয়া হল, কুটে মোসাহেব পচ্চু বাবুর পেছন দিকে বস্‌লেন, সুতরাং তাঁরে আর কে দেখ্‌তে পায়? বড়মানুষের কাছে থাক্‌লে লোকে যে 'পর্বতের আড়ালে আছ' বলে থাকে, তার ভাগ্যে তাই ঠিক ঘট্‌লো।

পচ্চু বাবুর চেহারা দেখে বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাস্‌চে, প্যালানাথবাবু আতর, পান, গোলাব ও তোব্‌রা দিয়ে খাতির কচ্চেন; এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠ্‌লো—প্যালানাথবাবুর মোসাহেব হীরেলাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজলিসে এলেন।

রাজা বাহাদুরের গির্ন্টিকরা গালভরা আসা সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো! অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর গৌরবর্ণ, দোহারা—মাথায় খিড়কীদার পাগড়ি—জোড়া পরা—পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদ্‌মাইশের বাদ্‌শা ও গ্যাকার সর্দার! বাই, রাজা দেখে কাছ বাগে সরে এসে নাচতে লাগলো, 'পুজোর সময় পরবস্তি হই যেন' বলেই তবল্‌জী ও সারেঙ্গীরা বড় রকমের সেলাম বাজালে, বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারের মত রাজা বাহাদুরকে একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়্‌তে লাগ্‌লো, শহরের অনেক বড়মানুষ রকম রকম পোশাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজলিস রন্‌রন্ কত্তে লাগ্‌লো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজলিসের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের শ্রাদ্ধতে বামুন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

ক্রমে আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড়মানুষ মজলিস থেকে খস্‌লেন, বুড়োরা সরে গেলেন, ইয়ারগোচের ফচ্‌কে বাবুরা ভালো হয়ে বস্‌লেন, বাইরা বিদেয় হল—খ্যাম্‌টা আসরে নাবলেন।

খ্যাম্‌টা বড় চমৎকার নাচ। শহরের বড়মানুষ বাবুরো প্রায় কি রবিবারে

বাগানে রেখে থাকেন। অনেকে ছেলেপুলে, ভাগ্‌নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে

একত্রে বসে খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান— কোনখানে কিস্‌ না দিলে প্যালা পায় না — কোথাও বলবার যো নয়! বারোইয়ারিতলায় খ্যাম্‌টা আরম্ভ হল, যাত্রার যশোদার মত চেহারা দুজন খ্যামটা-ওয়ালী ঘুরে ঘুরে কোমর নেড়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লো, খ্যাম্‌টা-ওয়ালারা পেছন থেকে 'ফণির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি' গাচ্চে, খ্যাম্‌টাওয়ালীরা ক্রমে নিমন্ত্রেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে এগিয়ে অগ্‌গরদানী ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন! রাত্তির দুটোর মধ্যেই খ্যাম্‌টা বন্দ হল—খ্যাম্‌টাওয়ালীরা অধ্যক্ষমহলে যাওয়া আসা কত্তে লাগলেন, বারোইয়ারিতলা পবিত্র হয়ে গেল।

কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখাদেখি অনেক বড়মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্ম গ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা) নবকৃষ্ণের একজন

ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফর্মেশনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক—তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান। সুতরাং কিছু দিন বাগবাজারেরা শহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাঁদের একখানি পাব্‌লিক আটচালা ছিল; সেইখানে এসে পাখি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন—এ সওয়ায় বোসপাড়ার ভেতরেও দু-চার গাঁজার আড্ডা ছিল। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্ধান হয়ে গ্যাচে, পাখিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু-একটা আদমরা বুড়োগোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দলভাঙা ও টাকার থাঁকৃতিতে মনমরা হয়ে পড়েচে, সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিশনরেরা উঠিয়ে দেছেন, এখন কেবল তার রুইন মাত্র পড়ে আছে। পূর্বের বড়মানুষরা এখনকার বড়মানুষদের মত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না; প্রায় সকলেরই একটি একটি র্যাঁড় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল—দু-তিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হত না, তেল মাখ্‌তেও ঝাড়া চার ঘণ্টা লাগতো—চাকরের তেল মাখানির শব্দে ভূমিকম্প হত—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখতে বস্‌তেন, সেই সময় বিষয়কর্ম দেখা, কাগজপত্রে সই ও মোহর চলতো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যদেব অস্ত যেতেন। এঁদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তির দুটো পর্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গাওনা বাজ্‌না জুড়ে দিতেন; দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠ্‌তেন —গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হত, বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস পেতো, কিন্তু ভদ্দরলোক বাড়ি ঢুকৃতে পেতো না; তাঁর বেলা ল্যাজা তরোয়ালের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম কত্তেন—দিন রাত ছিল ও রাত দিন হত! রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হতে আরম্ভ হল, (বাঙালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হল। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল। তার বিপক্ষে ধর্মসভা বস্‌লো, রাজা রাজ-নারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন। সতীদাহ উঠে গেল। হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হল। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন—ক্রমে সৎকর্মে বাঙালীদের চোক ফুটে উঠ্‌লো!

এদিকে বারোইয়ারিতলায় জমিদারী কবি আরম্ভ হল, ভাল্‌কোর জগা ও নিমক্তের রামা ঢোলে 'মহিম্নস্তব' 'গঙ্গাবন্দনা' ও 'ভেটকিমাছের তিনখানা কাঁটা' 'অগ্‌গরদ্বীপের গোপীনাথ' 'যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা' প্রভৃতি বোল্‌ বাজাতে লাগলো; কবিওয়ালারা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উঁচু) গান ধল্লেন—

চিতেন।

বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে ফাঁক।
এই বারে, গেরে, তোমার কল্লে সুর্পণখার নাক্‌॥

ক্যামন সুখ পেলে, কম্বলে শুলে, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর বড় নিতে জোর করে।
এখন জারী গেল, ভূর ভাঙলো তোমার, আত্তো জুলুম চলবে না!
পেনেলকোডের আইনগুণে মুখজ্যের পোর ভাঙলো জাঁক॥
বেআইনী দফারফা বদমাইশি হল খাক্‌॥

মোহাড়া।

কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না।
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুষড়ে গিয়েচেন।
কংসধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন।
এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ চলবে না॥

জমিদারী কবি শুনে শহুরেরা খুশি হলেন, দু-চার পাড়াগেঁয়ে রায় চৌধুরী, মুন্‌শী ও রায় বাবুরা মাতা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আম মোক্তাররা চোক্‌ রাঙিয়ে উঠ্‌লো, কবিওয়ালারা ঢোলের তালে নাচ্‌তে লাগ্‌লো!

স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ি সার বেঁধে বেরিয়েচে। মেথরেরা ময়লার গাড়ি ঠেলে জকসেনের ঘাটে চলেচে। বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও

ঝুলিতে মালা রেখে, জপ্‌লে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠক্‌ঠকি, সব ফাঁকি।

লোকের দুয়ারে দুয়ারে গান করে বেড়াচ্চে। কলু ভায়া ঘানি জুড়ে দিয়েচেন। ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই করা গোরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা জুড়ে যাচ্চে—ক্রমে ফরসা হয়ে এল! বারোইয়ারিতলায় কবি বন্দ হয়ে

গেল ; ইয়ারগোছের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধবুড়োরা কেত্তনের নামে এলিয়ে পড়্লেন ; দেশের গোঁসাই, গোঁড়া, বৈরাগী ও বোষ্টম একত্র হল—সিম্লের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেত্তন !

সিম্লের শাম উত্তম কিত্তুনী—বয়স অল্প—দেখ্তে মন্দ নয়—গলাখানি যেন কাঁসি খন্খন্ কচ্চে। কেত্তন আরম্ভ হল—কিত্তুনী 'তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননী চুরি করি খাঞীছে, আরে আরে ননী চুরি করি খাঞীছে তাথইয়া তাথইয়া' গান আরম্ভ কল্লে, সকলে মোহিত হয়ে পড়্লেন ! চারিদিক্ থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগ্লো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগ্লে ! কিত্তুনী কখনো হাঁটু গেড়ে কখনো দাঁড়িয়ে মধু বিষ্টি কত্তে লাগলেন—

হরিপ্রেমে একজন গোঁসাইয়ের দশা লাগ্লো, গোঁড়ারা তাঁকে কোলে করে নাচ্তে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন, জিব দিয়ে সেইখানের ধুলো চাট্তে লাগ্লো !

হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনো একটা রোগা দুর্বল গোঁসাই দেখতে পাইনি ! গোঁসাই বললেই একটা বিকটাকার ধূম্রলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোস্ট আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওটবার যো নাই ! গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন ! পেট ভরে মাল্পো ক্ষীর লোসেন ও রকমারি শিষ্য দেখে চৈতন্যচরিতামৃতের মতে—

যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন্।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ ॥
প্রেমারাধ্যা রাধাসমা তুমি লো যুবতী।
রাখ্লো গুরুর মান যা হয় যুকতি ॥

—প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় গোঁসাইরা আণ্ডারটেকরের (মুদ্দফরাস্) কাজও করে থাকেন—পাঁচ সিকে পেলে মন্তরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া মলে এঁরাই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন।

একবার মেদিনীপুরে এক ব্রকোদ গোঁসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন। এখানে সে উপকথাটিও বলা আবশ্যক—

পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবতন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না করে স্বামী সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ি, সকল ঘরগুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ির সামনের বৈঠকখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে দুটি শিবের মন্দির, একটি শান বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিল। ক্রিয়েকর্মে চক্রবর্তীকে মাছের জন্যে ভাবতে হত না। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, চাষের জন্যে পাঁচখানা লাঙল, পাঁচজন রাখাল চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ নিয়ত নিযুক্ত ছিল। চক্রবর্তীর উঠোনে দুটি বড় বড় ধানের মরাই ছিল, গ্রামস্থ ভদ্রলোক মাত্রেই চক্রবর্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেলতেন। চক্রবর্তীর ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র, শহরের ব্রকভানু চাটুয্যের মেজো ছেলে হরহরি চাটুয্যের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, বিয়ের সময় বর কনের বয়স ১০।১১ বছরের বেশী ছিল না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া, কি মেয়ে আনা কিছু দিনের জন্যে বন্ধ ছিল; কেবল পালপার্বণে, পিটে সংক্রান্তি ও ষষ্ঠীবাটায় তত্ত্ব তাবাস্ চল্‌তো।

ক্রমে হরহরিবাবু কালেজ ছাড়লেন, এদিকে বয়সও কুড়ি একুশ হল, সুতরাং চক্রবর্তী জামাই নে যাবার জন্য স্বয়ং শহরে এসে ব্রকভানুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রকভানুবাবু চক্রবর্তীকে কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখলেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরিরে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। একজন দরওয়ান, একজন সরকার ও একজন চাকর হরহরিবাবুর সঙ্গে গেল।

জামাইবাবু তিন-চার দিনে বেতালপুরে পৌছিলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে গেল চক্রবর্তীর শহুরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম ফেলে ছুটোছুটি জামাই দেখতে এল। ছোঁড়ারা শহুরে লোক প্রায় দ্যাখেনি, সুতরাং পালে পালে এসে হরহরিবাবুরে ঘিরে বস্‌লো—চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগ্‌লো; এক দিকে আপ-পাশ থেকে মেয়েরা উঁকি মাচ্চে এক পাশে কতকগুলো গোডিমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েচে; উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাইবাবুকে জলযোগ করাবার জন্যে বাড়ির

ভেতর নিয়ে যাওয়া হল। পূর্বে জলযোগের যোগাড় করা হয়েচে—পিঁড়ের নীচে চারদিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিল; জামাইবাবু যেমন পিঁড়ের পা দিয়ে বসতে যাবেন অমনি পিঁড়ে গড়িয়ে গেল; জামাইবাবু ধুপ করে পড়ে গেলেন। শালী শেলোজ মহলে হাসির গররা পড়লো! (জল-যোগের সকল জিনিসগুলিই ঠাট্টাপোরা) মাটির কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেশ, কাটের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলো মাকড়সা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাইবাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দু-চার শালা সম্পর্কের জুটে গেল; শহরের গল্প, পাড়াগাঁর তামাসা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গেল।

রজনী উপস্থিত—সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে—রাখালরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গোরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্চে। এক একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে করে নদীতে জল নিতে আসচে—লম্পট-শিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখবার জন্যেই বাঁশ ঝাড়ের ও তালগাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁঝিপোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাকচে। ভাম্ খটাশ ও ভোঁদড়রা শিবের ভাঙা মন্দির ও পড়ো বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্চে। চামচিকে ও বাদুড়রা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে—এমন সময় এক দল শিয়াল ডেকে উঠলো—এক প্রহর রাত্তির হয়ে গেল। ছেলেরা

জামাইবাবুরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল, পুনরায় নানা রকম ঠাট্টা ও আসল খেয়েই জামাইবাবু নির্দিষ্ট ঘরে শুতে গেলেন।

বিবাহের পর পুনর্বিবাহের সময়ও জামাইবাবু শশুরালয়ে যান নাই; সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন দুইজনেই বালক বালিকা ছিলেন; সুতরাং হরহরিবাবুর নিদ্রে হবার বিষয় কি! আজ

স্ত্রী সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রী মান করে থাক্‌লে তিনি কালেজী এডুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙাবেন এবং এর পর যাতে স্ত্রী লেখা পড়া শিকে তাঁর চিরহৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্‌বির কত্তে হবে। বাঙালীর স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া 'মিস স্টো, মিস্‌ টমসন ও মিসেস বয়্‌করলি ও লেডী লিটন, বুলুয়ার লিটন' হতে পারে না? বিলিতি স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা—তবে ক্যান বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফরনেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ মা ভাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্‌বিরের ত্রুটিমাত্র। বাঙালী সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না! বিদ্দেসাগরের স্ত্রীর হয়তো বর্ণপরিচয় নয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া—সাফরিদের মাদুলি ও বাল্‌সির চর্ণামেন্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এ ভিন্ন জামাইবাবুর মনে নানা রকম খেয়াল উঠলো, ক্রমে সেই সব ভাবতে ও পথের ক্লেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময় মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল—দেখেন যে ব্যালা হয়ে গিয়েচে—তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন।

এদিকে চক্রবর্তীর বাড়ির গিন্নীরা পরস্পর বলাবলি কত্তে লাগলেন যে 'তাই তো গা! জামাই এসেচেন, মেয়েও বেটের কোলে বছর পনেরো হল, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক।' সুতরাং চক্রবর্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির করে প্রভুর বাড়ি খবর দিলে—প্রভু, তুরী, খস্তি ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদীর আয়োজন হতে লাগলো!

হরহরিবাবু গুরুপ্রসাদীর কিছুমাত্র জান্‌তেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত। বাড়ির সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড় ও সর্বালংকারে ভূষিত হয়ে বেড়াচ্চে! তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েচেন। সুতরাং এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'ওহে আজ বাড়িতে কিসের ধুম?' ছোকরা বললে, 'জামাইবাবু, তা জানো না, আজ আমাদের গুরুপ্রসাদী হবে।'

'আমাদের গুরুপ্রসাদী হবে' শুনে হরহরিবাবু একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে গেলেন ও কি প্রকারে গুরুপ্রসাদী হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তারি তদ্‌বিরে ব্যস্ত রইলেন।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অস্ত গেল। সন্ধ্যাবধূ শাঁক ঘণ্টা ও ঝিঁঝিপোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগলেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সংবাদ দিতে গেলেন। নববধূর বাসরে আমোদ কর্‌বার জন্যে তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন—হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি। এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালরা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগলো—ফুলগাছেরা ফুলদল উপহার দিতে লাগলো দেখে আহ্লাদে প্রকৃতি সতী হাসতে লাগলেন।

চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতর বড় ধুম! গোস্বামী বরের মত সজ্জা করে জামাই বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন। হরহরিবাবুর স্ত্রী নানালংকার পরে ঘরে ঢুক্‌লেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগলো!

হরহরিবাবু ছোঁড়ার কাছে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার

পূর্ব্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখলেন যে, স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌তে লাগলে। প্রভু খাট থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন;

কন্যাটি কি করে! 'বংশপরম্পরানুগত ধর্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ' এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—সুড় সুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'বল, আমি রাধা তুমি শ্যাম'; কন্যাটিও অনুমতি মত 'আমি রাধা তুমি শ্যাম' তিনবার বলেচে, এমন সময় হরহরিবাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই 'কাঁদে বাড়ি বলরাম' বলে গোস্বামীকে রুলসই কত্তে লাগ্‌লেন; ঘরের বাইরে স্যাড়া বোষ্টুমরা খোল খত্তাল নিয়ে ছিল—প্রভু প্রসাদীকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে; গোস্বামীর রুলসইয়ের চিৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগ্‌লো, মেয়েরা উলু দিতে লাগ্‌লো, কাঁসর ঘণ্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থুল পড়ে গেল। হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙে বললেন। দারোগা ভদ্দরলোক ছিলেন (অতি কম পাওয়া যায়), তাঁরে অভয় দিয়ে সে দিন যথাসমাদরে বাসায় রেখে তার পর দিন বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে সকলের তাক লেগে গেল। 'যা, ইনি কেমন করে ঘরে ছিলেন!' শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে; সেই অবধি গুরুপ্রসাদী উঠে গেল, লোকেরও চৈতন্য হল; প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্ত্তমানে যে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদী চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্বাহ হয়।

আর এক বার এক শহরে গোঁসাই এক বেনের বাড়ি কেষ্টলীলা করে জব্দ হয়েছিলেন, সেটিও এই বেলা বলে নিই।

রামনাথ সেন ও শ্যামনাথ সেন দুই ভাই, শহরে চার-পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দী। দিনকতক বাবুদের বড় জলজলা হয়ে উঠেছিল—চৌযুড়ি, ভেঁপু, মোসাহেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি। উমেদার, বেকার, রেকমেণ্ড চিঠিওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ কত্তো! বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মত্ত থাক্‌তেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবেই বাবুদের কাজকর্ম দেখ্‌তেন। এক দিন রবিবার বাবুরো বাগানে গিয়েচেন, এই অবকাশে বাড়ির প্রভু,—খন্তি, খোল, ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত; বাড়ির ভেতরে খবর গেল। প্রভুকে সমাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হল, সকল মেয়েরা একত্র হলেন, চৈতন্যচরিতামৃত

ও ভাগবতের মতে বেছে গোছালো গোছালো লীলে আরম্ভ কল্লেন। ক্রমে

লীলা শেষ করে গোস্বামী বাড়ি ফিরে যান—এমন সময় ছোট বাবু এসে পড়লেন। ছোট বাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'কেমন প্রভু! ভাগবতের মতে লীলে ছ্যাখান হল?' প্রভু ভয়ে আমৃতা আমৃতা গোছের 'আজ্ঞা হাঁ।' করে সেরে দিলেন। ছোট বাবুর কাছে একজন মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিল, সে বললে, 'হুজুর! গোঁসাই সকল রকম লীলে করে চললেন, কিন্তু গোবর্ধনধারণটা হয়নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্ধনধারণটাও করে দেওয়া যায়, সেটা বাকি থাকে কেন?' ছোট বাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেওয়া হল—দরজার পাশে একখানা দশ-বারো মন পাথর পড়েছিল, জন কতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরের চাপানে গোস্বামীর কোমর ভেঙে গেল। সেই অবধি প্রভুরা ত্যামন ত্যামন স্থলে লীলা কত্তে আর স্বয়ং যান না—প্রয়োজন হলে রকমারি শিষ্যারা স্বয়ং প্রভুর বাড়ি পালকি চড়ে উপস্থিত হন।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় কেত্তন বন্ধ হয়ে গেল। কেত্তনের শেষে একজন বাউল সুর করে এই গানটি গাইলে:

বাউলের সুর।

আজব শহর কলকেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কী কেতা।

হেন্তা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা ;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইশির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আসা ছড়ি শুঁড়ী সোনারবেনের কড়ি,
খ্যামটা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোখরাঙানি, লুকোচুরির ফের গাঁতা।
গিলটি কাজে পালিশ করা, রাঙা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাবে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

গানটি শুনে সকলেই খুশি হলেন। বাউলে চার আনার পয়সা বক্‌সিস পেলে ; অনেকে আদর করে গানটি শিখে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পুজো শেষ হল, প্রতিমেখানি আট দিন রাখা হল, তার পর বিসর্জন করবার আয়োজন হতে লাগলো। আমমোক্তার কানাইধনবাবু পুলিস হতে পাশ করে আন্‌লেন। চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক্‌সোয়ার, নিশেন ধরা ঝিরিঙ্গী, আসাসোঁটা, ঘড়ি ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হল। বাহাদুরী কাট তোলা চাকা একত্র করে গাড়ির মত করে তাতেই প্রতিমে তোলা হল, অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চললেন, দু-পাশে সঙেরা সার বেঁধে চললো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, রাঁড়েরা ছাতের ও বারান্দার উপর থেকে রূপো-বাঁধানো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চলতি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখ্‌তে লাগলেন। হাটখোলা থেকে জোড়াসাঁকো ও মেছোবাজার পর্যন্ত

ঘোরা হল, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জন করা হল। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল, আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো। বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাকলে অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে বাবুরো মড়া পুড়িয়ে এলেন!

বারোইয়ারি পুজোর সম্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজার দেনা চেগে উঠ্‌লো, গদি ও আড়ত উঠে গেল, শেষে ইন্‌সলভেন্ট নিয়ে ফরেশডাঙায় গিয়ে বাস করেন, কিছু দিন বাদে হটাৎ ঘর চাপা পড়ে মরে গেলেন! আমমোক্তার কানাইধন দত্তজা সুপ্রীমকোর্টে জাল সাক্ষী দেওয়া অপরাধে স্যার রবার্ট পিল সাহেবের বিচারে চোদ্দ বছরের জন্যে ট্রান্‌সপোর্ট হলেন, তাঁর পরিবাররা কিছু কাল অত্যন্ত দুঃখে কাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগ্‌লো। মুড়িঘাটা লেনের হুজুর কোন বিশেষ কারণে বারোইয়ারি পুজোর মধ্যেই কাশী গেলেন। প্যালানাথবাবু একদিন কতকগুলি বাই ও মেয়েমানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে আচম্‌কা একটা বড় ঝড় উঠ্‌লো, মাজিরে অনেক চেষ্টা কল্লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্‌টে পড়ে চুরমার হয়ে ডুবে গেল। বাবু বড়মানুষের ছেলে, কখনো সাঁতার দেন নাই, সুতরাং জলের টানে কোথায় যে গিয়ে পড়লেন তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই। মুখুয্যেদের ছোট বাবু ক্রমে ভারী গাঁজাখোর হয়ে পড়্‌লেন, অনবরত গাঁজা টেনে তাঁর যক্ষ্মাকাশ জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্বরের দাড়ি রাখলেন, বাল্‌সির চরণামৃত খেলেন, সাফরিদের মাদুলি ধারণ কল্লেন; কিন্তু কিছুতে কিছু হল না, শেষে বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেছেন আজও তার ঠিকেনা হয় নাই। প্রধান দোয়ার গবারাম গাওনা ছেড়ে পিতৃক পেশা গিল্‌টি অবলম্বন করে কিছু কাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পুজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মরেচেন। পচ্চুবাবু, অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আর আর অধ্যক্ষ ও দোয়ারেরা এখনও বেঁচে আচেন; তাঁদের যা হবে, তা এর পরে বক্তব্য।

হুজুক

সাধারণে কথায় বলেন, 'হুনরেচীন' ও 'হুজ্জুতে বাঙ্গাল'; কিন্তু হুতোম বলেন 'হুজুকে কল্‌কেতা'। হেতা নিত্য নতুন হুজুক, সকলগুলিই সৃষ্টি-ছাড়া ও আজগুব! কোন কাজকর্ম না থাক্‌লে 'জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা' দিতে হয়, সুতরাং দিবারাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে বাতকর্ম কত্তে কত্তে নিষ্কর্মা লোকেরা যে আজগুব হুজুক্ তুল্‌বে, তার বড় বিচিত্র নয়! পাঠক! যত দিন বাঙালীর বেটার অকুপেশন না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙালীর বর্তমান গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফর্মেশন না হচ্ছে, তত দিন এই মহান্ দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্মনীতিতে যাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যথার্থ অর্থ জানেন না, সুতরাং অক্লেশে আটপৌরে ধুতির মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হয় না।

ছেলেধরা

আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুন্‌লেম, শহরে ছেলে ধরার বড় প্রাদুর্ভাব। কাবুলী মেওয়াওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়, সেথায় নানা বিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলে-টাকে তারি একটা বাগানের ভেতর ছেড়ে দ্যায়, সে অনবরত পেট পুরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে ফুলে

ওঠে—রং দুধে আল্তার মত হয়, এমন কি টুস্কি মাল্লে রক্ত বেরোয়, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর উপরপানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ক্রমে কড়ার ঘি টগবগিয়ে ফুটে উঠলে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোসা টোসা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে; ক্রমে ছেলের সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে নানাবিধ মেওয়া ও মিছরির ফোড়ন দিয়ে কড়াটি নাবানো হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান! আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবধি একলা বাড়ির বাহিরে প্রাণান্তেও যেতেম না ও সেই অবধি নেড়েরের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গেল।

প্রতাপচাঁদ

আমরা বড় হলেম, হাতে খড়ি হল। একদিন গুরুমহাশয়ের ভয়ে চাকরদের কাছে লুকিয়ে রয়েচি, এমন সময় চাকররা পরস্পর বলাবলি কচ্চে যে, 'বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ একবার মরেছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেচেন, বর্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্যে নালিশ করেচেন, শহরের তাবৎ বড়মানুষরা তাঁকে দেখতে যাচ্চেন—এবারে পরাণবাবুর সর্বনাশ; পুষ্যিপুত্তুর নামঞ্জুর হবে!' নতুন জিনিস হলেই ছেলেদের কৌতূহল বাড়িয়ে ছায়, শুনে অবধি আমরা অনেকেরই কাছে খুঁটেরে খুঁটেরে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্তেম; কেউ বল্তো, 'তিনি এক দিন এক রাত জলে ডুবে থাক্‌তে পারেন'; কেউ বল্তো, 'তিনি গুলিতেও মরেননি—রানী বলেচেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ—ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কান কেটে গিয়েছিল, সেই কাটাতেই তাঁর ভগ্নী চিনে ফেললেন!' কেউ বললে, 'তিনি কোন মহাপাপ করেছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরদের মত অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলেন! বাস্তবিক তিনি মরেননি, অম্বিকা কালনায় যখন তাঁকে দাহ কত্তে আনা হয়, তখন তিনি বাক্সের মধ্যে ছিলেন না, সুদ্দু বাক্স পোড়ানো হয়।' শহরে বড় হুজুক পড়ে গেল প্রতাপচাঁদের কথাই সর্বত্র আন্দোলন হতে লাগ্‌লো।

কিছু দিন এই রকমে যায়—এক দিন হঠাৎ শোনা গেল, সুপ্রীমকোর্টের সূক্ষ্ম বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে পড়েছেন। শহরের নানাবিধ লোক, কেউ সুবিধে কেউ কুবিধে—কেউ বললে, 'তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন'—কেউ বললে,

'ভাগ্যি দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রুব হল! তা না হলে পরাণ বাবু টেবুটা পেতেন।' এদিকে প্রতাপচাঁদ জাল সাব্যস্ত হয়ে বরানগরে বাস কল্লেন। সেথায় বুজরুক হন—খান্‌কী, ঘুস্‌কি ও গেরস্ত মেয়েদের ম্যালা লেগে গেল, প্রতাপচাঁদ না পারেন স্নান কর্ম্মই নাই। ক্রমে চল্‌তি বাজনার মত প্রতাপচাঁদের কথা আর শোনা যায় না; প্রতাপচাঁদ পুরানো হল,—আমরাও পাঠশালে ভর্তি হলেম।

মহাপুরুষ

পাঠক! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাস্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্চে! এক দিন আমরা স্কুলে একটার সময়ে ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌চি, এমন সময় আমাদের জলতোলা বুড়ো মালী বললে যে, 'ভূকৈলেসের রাজাদের বাড়ি একজন মহাপুরুষ এসেচেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অশ্বত্থগাছ ও উইয়ের ঢিপি হয়ে গিয়েচে—চোখ বুজে ধ্যান কচ্ছেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুল্‌লেই সমুদয় ভস্ম করে দেবেন।' শুনে আমাদের বড় ভয় হল!
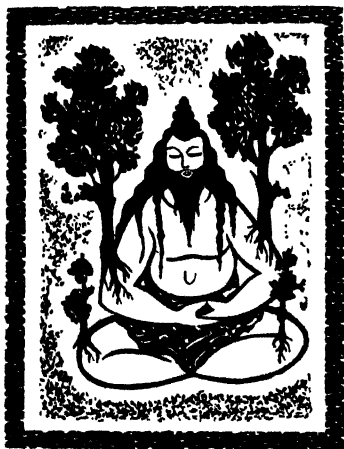
ইস্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়িতে এসেও মহাপুরুষের বিষয় ভাবতে লাগ্‌লেম; লাট্টু, ঘুড়ি, ক্রিকেট ও পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ দ্যাখ্‌বার ইচ্ছে ক্রমে বলবতী হয়ে উঠ্‌লো; শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী', 'পায়রা রাজা,' 'রাজপুত্তুর, পাত্তরের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর—চার বন্ধু' 'তালপত্তরের খাঁড়া জাগে, ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে' ও 'সোনার কাটি রূপোর কাটি' প্রভৃতি কত রকম উপকথা

কইতেন। কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়তুম।—হায়! বাল্যকালের সে সুসময় মরণকালেও স্মরণ থাক্‌বে—অপরিচিত সংসার হৃদয় কমলকুসুম হতেও কোমল বোধ হত, সকলেই বিশ্বাস ছিল; ভূত পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর রোমাঞ্চ হত—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জান্‌ত না—অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

আমরা শোবার সময় ঠাকুরমাকে সেই মালীর মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুরমা শুনে খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে একজন চাকরকে পরদিন সকালে মহাপুরুষের পায়ের ধুলো আন্‌তে বলে দিয়ে মহাপুরুষের বিষয়ে আরো দু-এক গল্প বললেন।

ঠাকুরমা বললেন,—বছর আশী হল (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েচে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার সময় পথে জঙ্গলের ভেতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ দ্যাখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচৈতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন। মাজিরে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড় যত্ন করে নৌকোয় রাখলেন। তখন ছাপ্‌ঘাটির মোহনায় জল থাক্‌তো না বলে কাশীর যাত্রীরে বাদাবনের ভেতর দিয়ে আসতেন, সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আসতে হল। একদিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকো যাচ্চে, মাজি ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময় জলের ধারে ঠিক ঐ রকম আর একজন মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। এদিকে এ মহাপুরুষ নৌকোর গলুইয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন, ডাঙার মহাপুরুষ এসে দাঁড়াবামাত্র চোখ চেয়ে দেখলেন, এরি মধ্যে ডাঙার মহাপুরুষও হাস্‌তে হাস্‌তে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন, মাজি ও অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো! বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু আর মহাপুরুদের দেখ্‌তে পেলেন না, এঁরা সব সেকালের মুনি ঋষি, কেউ দশ হাজার কেউ বিশ হাজার বৎসর তপিস্যে কচ্চেন; এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন।

আর একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিল, তাঁর গায়ে বড় বড় অশত্থগাছের শেকড় জমে গিয়েছিল, আর শরীর শুকিয়ে চ্যালা কাঠের মত হয়েছিল। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক

মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে একদিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গ্যালেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না!—শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা ঘুমিয়ে পড়লেম। ঠাকুরমাও শুতে গেলেন।

তার পর দিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পায়ের ধুলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটি বড় জয়ঢাকের মত মাতুলিতে সেই ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, পেত্নী শাঁকচুন্নী ও ব্রহ্মদত্তিদের হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলাম।

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়লেম—কালেজে ভর্তি হলেম—সহাধ্যায়ী দু-চার সমকক্ষ বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হল; এক দিন আমরা একটার সময় গোলদীঘির মাঠে ফড়িং ধরে খ্যালা করে বেড়াচ্চি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে বেড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড়মানুষের বাড়ি রাঁধুনী বামুন ছিলেন, এডুকেশন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সেনবাবুর সুপারিসে ও প্রিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন; পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভালবাসতেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্টু কত্তে ক্রটি কত্তো না। পণ্ডিত মহাশয় মাটে আস্‌বা-মাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে; আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম, পণ্ডিত মহাশয় মিঠে খিলি বড় পছন্দ কত্তেন, পান খেয়ে আমাদের নাম ধরে বললেন, 'আরে হুতোম! আর শুনেচো? ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিল, ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে গুল্ পুড়িয়ে দেন, জলে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু কিছুতেই ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চেতনা হল; এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গা টিপে পয়সা নিচ্চে, রাজাদের পাকা টেনে বাতাস কচ্চে, যা পাচ্চে তাই খাচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব-ভুর ভেঙে গ্যাচে!'

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্ হয়ে পড়লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তিটুকু ছিল—মরিচবিহীন কর্পূরের মত—স্টপরহীন ইথরের মত একেবারে উবে গেল। ঠাকুরমার মাতুলিটি তার পর দিনেই খুলে ফেলা হল, ভূত শাঁকচুন্নী, পেত্নীদের ভয় আবার বেড়ে উঠ্‌লো।

লালা রাজাদের বাড়ি দাঙগা

আমরা স্কুলে আর এক কেলাস উঠ্‌লেম, রাঁধুনী বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গেল। এক দিন আমরা পড়া বল্‌তে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় গাধার টুপি মাথায় দিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কন্‌ফাইন্‌ হয়ে রয়েচি, মাস্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গ্যাচেন (তাঁর খিদে বরদাস্ত হয় না, কিন্তু ছেলেদের হয়), এক বামুন বাবুদের বাড়ির ছোটবাবুর মুখে শ্যামা পাখির বোল—'বক বকম্‌ বক বকম্‌' করে পায়রার ডাক ডেকে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও পনি টাট্টু সেজে কদম ছ্যাখাচ্চেন; এমন সময় কাশীপুর অঞ্চলের একজন ছোকরা বললে যে, 'কাল বৈকালে পাক্‌পাড়ার লালা বাবুদের (শ্রীবিষ্ণু! আজকাল রাজা) লালারাজাদের বাড়ি এক দল গোরা মাতাল হয়ে এসে চার-পাঁচজন দরওয়ানকে বর্শায় বিঁধে গিয়েচে, রাজারা ভয়ে হাসান হোসেনের মত একটা পুরনো পাত্‌কোর ভেতর লুকিয়ে প্রাণরক্ষা করেচেন।' (বোধ হয় কেবল গিরগিটির অপ্রতুল ছিল) আর একজন ছোকরা বলে উঠলো, 'আরে তা নয়, আমরা দাদার কাছে শুনিচি, রাজাদের বাড়ির সামনের গাছে একটা কাগ মেরেছিল বলে রাজাদের জমাদার সাহেবদের মাস্তে আসে,' আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে বললে, 'আরে না হে না, ও সব বাজে কথা! আমারও বাড়ি টালাতে, রাজাদের বাড়ির পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জানো? তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়কি। রাজাদের একজন আমলার ভাই ঠিক বানরের মত মুখ; তাই দেখে একজন সাহেব ভেংচেছিল, তাতে আমলাও ভেংচোয়, তাতেই সাহেবরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দলবল সমেত এসে গুলি করে।' অনেকে অনেক রকম কথা বল্‌চেন, এমন সময় মাস্টারবাবু তামাক খাবার ঘর থেকে এলেন, ছোট বাবুর পনি টাট্টুর কদম ও 'বক বকম্‌' বন্দ হয়ে গেল, রাজারা বাঁচলেন—ঢং ঢং করে দুটো বাজলে কেলাস বসে গেল, আমরাও জল খেতে ছুটি পেলেম। আমরা বাড়ি গিয়ে রাজাদেব ব্যাপার অনেকের কাছে আরো ভয়ানক রকম শুন্‌লেম, বাংলা কাগজওয়ালারা 'এক দল গোরা বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল, দলের মধ্যে একজনের জলতৃষ্ণা পাইল, রাজাদের বাড়ি

যেমন জল খাইতে যাইবে, জমাদার গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাহাতে সঙ্গের কর্নেল গুলি করিতে হুকুম দ্যান' প্রভৃতি নানা আজগুবী কথায় কাগজ পোরাতে লাগ্‌লেন। শহরের পুর্বের বাংলা খবরের কাগজ বড় চমৎকার ছিল 'অমুক বাবুর মত দাতা কে!' 'অমুক বাবুর মার শ্রাদ্ধে ক্রোর টাকা ব্যয়' (বাবু মুচ্ছুদ্দী মাত্র) 'অমুক মাতাল জলে ডুবে মরে গ্যাচে,' 'অমুক বেশ্যার নৎ খোয়া গিয়েচে, সন্ধান করে নিতে পাল্লে সম্পাদক তার পুরস্কারস্বরূপ তারে নিজ সহকারী করবেন' প্রভৃতি আলত পালত কথাতেই পত্র পুরুতেন, কেউ গাল দিয়ে পয়সা আদায় কত্তেন, কেউ পয়সার প্রত্যাশায় প্রশংসা কত্তেন—আজকালও অনেক কাগজে চোরা গোপ্তান চলে!

শেষে সঠিক শোনা গেল যে, একজন দরওয়ানকে একজন ফিরিঙ্গী শিকারী বাক্‌বিতণ্ডায় ঝকড়া করে গুলি করে।

ক্রিশ্চানি হুজুক

পাক্‌পাড়া রাজাদের হাঙ্গামা চুকতে চুকতে হুজুক উঠ্‌লো, 'রণজিৎসিংহের পুত্র দলিপ যিসুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচেন, তাঁর সঙ্গে সমুদায় শিখেরা ক্রিশ্চান হয়েচেন, ও জনকতক ভাটপাড়ার ঠাকুরও ক্রিশ্চান হবেন!' ভাটপাড়ার গুরু গুষ্ঠীরে প্রকৃত হিন্দু। তারা ক্রিশ্চান হবেন শুনে অনেকে চম্‌কে উঠ্‌লেন, শেষে ভাট্‌পাড়ার বদলে পাতুরেঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বেরিয়ে পড়লেন! সমধর্মা কৃষ্ণমোহন কন্যা উচ্ছুগ্‌গু করে দিলেন, এয়োরও অভাব রইলো না! শহরে যখন যে পড়তা পড়ে, শিগগির তার শেষ হয় না; সেই হিড়িকে একজন ইস্কুল মাস্টার কালীঘেটে হালদার, একজন বেনে কায়স্থও ক্রিশ্চান দলে বাড়লো—দু-চার জন বড় বড় ঘরের মেয়েমানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন। শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগল, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগলেন। ক্রিশ্চানি হুজুক রাস্তার চল্‌তি লণ্ঠনের মত প্রথমে আশপাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গেল। আমরাও ক্রমে বড় হয়ে উঠলেম—স্কুল আর ভালো লাগে না।

মিউটিনি

পাঠকগণ! একদিন আমরা মিছেমিচি ঘুরে বেড়াচ্চি, এমন সময় শুন্‌লেম, পশ্চিমের সেপাইরে ক্ষেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লীর নেড়ে চীফ আবার 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' হবেন —ভারী বিপদ্! শহরে ক্রমে হুলুস্থুল পড়ে গেল, চুনো গলি ও কসাইটোলার মেটে ইদ্‌রুস, পিদ্‌রুস, গমিস্, ভিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গীরে খাবার লোভে ভলিন্টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বস্‌লো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠতে লাগলো—আজ দিল্লী গেল,—কাল কানপুর হারানো হল, ক্রমে পাশাখ্যালার হারকেতের মত ইংরেজরা উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গেল,

'শ্রীবৃদ্ধিকারী' সাহেবরা (হিঁদুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙবার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙালীর উপর ঝাড়তে লাগলেন! লর্ড ক্যানিংকে বাঙালীদের অস্ত্রশস্ত্র (বঁটি ও কাটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙালীরা বড় বড় কাজকর্ম না পায় তারও তদ্‌বির হতে লাগলো, ডাকঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গেল, নীলকরেরা অনরেরী মেজেস্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শ্যামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন। শ্যামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—

সেপাই কোন্ ছার! লখ্নৌয়ের বাদশাকে কেল্লায় পোরা হল, গোরারা সময় পেয়ে দু-চার বড় বড় ঘরে লুট্তরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্শাল ল জারি হল, যে ছাপাযন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, সে ছাপাযন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম ছাখে, ব্রিটিশ কুলের সেই চিরপরিচিত ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছু কাল সিকৃলি পর্লেন। বাঙালীরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে 'যদিও একশ বছর হয়ে গেল, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙালীই আচেন—বহুদিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকান্দের মত হতে পারেননি। (পার্বেন কি না তারও বড় সন্দেহ!) তাদের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠতে হলে স্ত্রীর বা চাকরানীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অস্তরের মধ্যে টেবিল ও পেন্নাইফ ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই কর্বেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। বল্তে কি, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচ্মাত্র করে নিয়েচেন। যদি গবর্নমেণ্টের হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে ছান—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতি বাবুরা ফিরৃতি ফলারে বসেন—ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বনাতের প্যান্টুলেন ও বিলিতি বদমাইশি থেকে স্বতন্ত্র হন।

ইংরেজরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লর্ড ক্যানিঙের রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত কল্লেন, শহরে হুজুকের একশেষ হয়ে গেল। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আস্তে লাগলো—সেই সময় বাজারে এই গান উঠলো:

গান

বিলাত থেকে এল গোরা,
মাথার পর কুর্তি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা।

টানটিয়া টোপির মান,
হবে এবে খর্ব্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা ।।

বাঙালীরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে বড় পটু ; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, 'বিধবা-বিবাহের আইন পাশ ও বিধবা-বিবাহ হওয়াতেই সিপাইরে ক্ষেপেচে। গভর্নমেণ্ট বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েচেন—বিদ্যেসাগরের কর্ম্ম গিয়েচে—প্রথম বিধবাবিবাহ বর শিরীশের ফাঁসি হবে !'

কোথাও হুজুক উঠলো, 'দলিপ সিংকে ক্রিশ্চান করাতে, নাগপুরের রানীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লখ্‌নৌয়ের বাদশাই যাওয়াতেই মিউটিনি হল !'

নানা মুনির নানা মত ! কেউ বললেন, সাহেবরা হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দ্যান্, তাতেই এই মিউটিনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিত রাঁড়— কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হাওলাদারের বাড়ির গিন্নীরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না ! দুই একজন ভট্‌চায্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দ্যাখালেন।

ক্রমে সেপাইয়ের হুজুকের বাড়্‌তি কমে গেল—আজ দিল্লী দখল হল—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে লখ্‌নৌ পাওয়া হল। মিউটিনির প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন— অবশিষ্টেরা ক্যানিঙের পলিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গেলেন !

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুরনো বছরের মত বিদেয় হবেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন ; বাজী তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা 'কুইনের খাসে প্রজার আর দুঃখ রবে না, বাড়ি বাড়ি গেয়ে বেড়াতে লাগলেন, গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন 'ছেলে কি মেয়ে' লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রোক্লেমেশনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হল।

মিউটিনির হুজুক শেষ হল—বাঙালীরা ফাঁসি ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হল, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গীর পেলেন। অনেক বামুনে কপাল ফলে উঠলো, 'যখন যার কপাল ধরে—' ইত্যাদি কথায় সার্থকতা হল। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন

লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জান্‌তে পারে, সেইরূপ মিউটনি উপলক্ষে গবর্নমেণ্টও বাঙালী শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জান্‌তে অবসর পেলেন, 'শ্রীবৃদ্ধিকারীরা' আশা ও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বলতে ছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙালীদের দেখতে লাগ্‌লেন—আমরাও স্কুল ছাড়লেম। আঃ! বাঁচলেম—গায়ে বাতাস লাগ্‌লো।

নরাফেরা

আমরা ছেলেবেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম, স্কুল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মতন উথলে উঠলো, (বোধ হয় পাঠকরা এই হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাতেই আমাদের জ্যাটামির দৌড় বুঝতে পেরে থাক্‌বেন) আমরা প্রলয় জ্যাটা হয়ে উঠলেম—কেউ কেউ আদর করে 'চালাকদাস' বলে ডাক্‌তে লাগলেন।

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাংলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্বে নানাপ্রকার রূপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেইরূপ মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়িতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুশি হতেন ও কখনো কখনো আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার পিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ্‌ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোতলা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম্‌, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাতে ছড়িয়ে দিতুম। আর আমাদের মুঞ্জরী বলে দিব্যি একটি সাদা বেড়াল ছিল (আহা! কাল সকালে সেটি মরে গ্যাচে —বাচ্চাও নাই) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে বড় আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সূত্র হল; টিকি, ফোঁটা ও রাঙা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য দেখলেই তক্ক কত্তে যাই, ছোঁড়া-গোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকি কেটে নিই,

কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখ্‌তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহংকার করি—সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠ্‌লো—কখনো বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হব (ওঃ শ্রীবিষ্ণু, কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে কি ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জন্‌সন? না! (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন) সেটি বড় অসঙ্গত হয়, তবে রামমোহন রায়? হাঁ, একদিন রামমোহন রায় হওয়া যায় —কিন্তু বিলেতে মত্তে পার্‌বো না!

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হল, তারই সার্থকতার জন্যেই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজ্‌লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম —সম্পাদক হতে ইচ্ছা হল—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও ঐ দলের একজন ছোট খাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে!

হায়! অল্প বয়সে এক একবার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগ্‌লামো করেচি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পায়; আবার এখন যে পাগলামি প্রকাশ কচ্চি, এর জন্যে বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপ তোলা রইলো; মৃত্যু-শয্যার পাশে যবে এইগুলির ভয়ানক ছবি দ্যাখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাহ কত্তে থাক্‌বে, তখন সেই অনন্যআশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না! বাপ-মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে 'বাবা গো—মা গো' বলে কাঁদে, আমরাও তেমনি সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন নিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই, পাঠক! তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দ্যাখাতে দ্যাখাতে তরে যাব!

প্রলয় গর্মিতে একদিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের একজন মুহুরি বললে যে, 'আমাদের দেশে হুজুক উঠেচে, ১৫ই কার্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আস্‌বে'—জন্মের মধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাসের মত শহরের কোন কোন বেনে বাবুরা সিঙ্গিবাহিনী ঠাকরুণের পালায় যেমন ছোট

আদালতের দু-চার কয়েদী খালাস করে অহংকার করেন, সেইরকম স্বর্গে কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতকগুলি কয়েদী খালাস করবেন, নদের রামশর্মা আচাষ্যি গুণে বলেচেন। আমরা এই অপরূপ হুজুক শুনে তাক্ হয়ে রইলেম! এদিকে শহরেও ক্রমে গোল উঠ্লো—'১৫ই কার্তিক মড়া ফিরবে।' বাংলা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিস পেলেন—একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্বের গেরোটি যেমন আল্‌গা হয়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে শহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যেসাগরের প্রতি যে ভক্তিটুকু জন্মেছিল, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থর্‌মমেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়্লো।

শহরের যেখানেই যাই, সেইখানেই মড়া ফেরবার হুজুক। আশা, নির্বোধ স্ত্রী ও পুরুষ দলের প্রিয়সহচরী হলেন; জোচ্চার ও বদমাইশেরা সময় পেয়ে গোছালো গোছালো জায়গায় মড়া ফেরা সেজে যেতে লাগ্লো; অনেক গেরেস্তোর ধর্ম নষ্ট হল—অনেকের টাকা ও গয়না গেল—বাজারে হত্তেল মাগ্‌গি হয়ে উঠ্লো! ক্রমে আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যার মত, শোকাতুরের সময়ের মত ১৫ কার্তিক নবাবী চালে এসে পড়লেন। দুর্গোৎসবের সময় সন্ধিপুজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্যে পৌত্তলিকরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন—ডাক্তারের জন্যে মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়রা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটির দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্রভ্রাতাহীন নির্বোধ পরিবারেরা সেই রকম ১৫ই কার্তিকের অপেক্ষা করেছিলেন। ১৫ই কার্তিক দিল্লীর লাড্ডু হয়ে পড়্লেন—যাঁরা পূর্বে বিশ্বাস করেননি, ১৫ই কার্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিশলেন। ছেলেবেলা আমাদের একটি চীনের খরগোশ ছিল, আজ বছর আষ্টেক হল সেটি মরেচে—আমরাও তার ফিরে আসবার জন্য কচি কচি দূর্বো ঘাস তুলে, বহু কালের ভাঙা পিঁজরেটি ঝেড়ে ঝুড়ে তুলো পেড়ে বিছানা-টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেম।

১৫ই কার্তিক মড়া ফিরবে কথা ছিল, আজ ১৫ই কার্তিক। অনেকে মড়ার অপেক্ষায় নিম্‌তলা ও কাশী মিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাত্তির দশটা বাজে, মড়া ফির্লো না; অনেকে মড়ার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন; মড়া ফেরার হুজুক থেমে গেল!

আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠ্‌লেম; দু-চারজন আমাদের অবস্থার হিংসে কত্তে লাগ্‌লেন; জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকি পড়তে লাগলো—আমাদের বিপদে মুচকে হাসেন ও আমোদ করেন; তাঁদের এক চোখ কানা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু-চক্ষু কানা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পার্‌লে তার বাটিটি নষ্ট হয়—স্বয়ং না হয় গু গুলেই খেলেন! জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেইরকম ব্যবহার বেরুতে লাগলো! লোকের আঁটকুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভালো, তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলেপুলে নিয়েও বাস করা কিছু নয়! আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকেয়ী ও শূর্পণখা হতেও সরেস! ক্রমে একদল শত্রু জন্মালেন, একদল ফ্রেণ্ডও পাওয়া গেল। যাঁরা শত্রুর দলে মিশলেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দে কত্তে আরম্ভ করলেন। ফ্রেণ্ডরা সাধ্যমত ডিফেণ্ড কত্তে লাগলেন, শত্রুরা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করেছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্‌লেন না; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখ্‌লুম যে, যদি তাদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চট্‌তে পারেন; কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলুম না, বরং সন্ধানে বেরুলো যে, নিন্দুক দলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্যন্তও নাই—লোকের সাধ্যমত উপকার করা যেমন কতক-গুলির চিরন্তন ব্রত, সেইরূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও শহরের কতকগুলি লোকের কর্তব্য কর্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকরা কিছুকাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামেন, তেমনি এঁরা আপনা আপনি থাম্‌বেন; তবে অনেকের এই পেশা বলেই যা হোক্—পেশাদারের কথা নাই!

নানা সাহেব

মড়া ফেরা হুজুক থাম্‌লে, কিছুদিন নানাসাহেব দশ-বারো বার মরে গেলেন, ধরা পড়লেন ও আবার রক্তবীজের মত বাঁচ্‌লেন। সাতপেয়ে গোরু—দরিয়াই ঘোড়া—লখ্‌নৌয়ের বাদশা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েলস্‌ সাহেব—নীল বান্দরে লঙ্কাকাণ্ডে লণ্ডের মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেক্‌ড়ে বাঘের উৎপাতের মত ইংলিশম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপাত—ব্রহ্মধর্ম-প্রচারক রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলির ঘোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠলো।

সাতপেয়ে গোরু

সাতপেয়ে গোরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দু-পয়সা বেট হল! গোরু দ্যাখবার জন্য অনেক গোরু একত্র হলেন। বাকি গোরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগলো; কিছু দিনের মধ্যে সাতপেয়ে গোরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গেলেন।

দরিয়াই ঘোড়া

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকমে রোজগার কত্তে লাগলেন; বেশীর মধ্যে বিক্রি হবার জন্যে দু-চাব মাতালো মাতালো থামওলা সেপাই পাহারা ও গোরা কোচম্যান্‌ (যেখানে অন্দর মহলেও ঘোড়ার সর্বদা সমাগম) ওয়ালা বাড়িতে গমনাগমন কল্লেন। কে নেবে? লাক টাকা দর! আমাদের শহরের কোন কোন বড় মানুষের যে ত্রিশ-চল্লিশ লাক টাকা দর, পিঁজরেয় পুরে চিড়িয়াখানায় রাখবারও বিলক্ষণ উপযুক্ত; কিন্তু কৈ! নেবার লোক নাই! এখন কি আর সৌখিন আছে? বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্ধমানের তুল্য

চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই—সেথায় তম্ব, রম্ভ, লক্কার, উল্লুক, ভাল্লুক প্রভৃতি নানা রকম আজগুবী কেতার জানোয়ার আছে, এমন কি এক আদ্‌টির জোড়া নাই।

লখ্‌নৌয়ের বাদ্‌শা

দরিয়াই ঘোড়া কিছু দিন শহরে থেকে শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গেলেন। লখ্‌নৌয়ের বাদ্‌শা দরিয়াই ঘোড়ার জায়গায় বসলেন—শহরে হুজুক উঠলো, 'লখনৌয়ের বাদ্‌শা মুচিখোলায় এসে বাস করচেন, বিলেত যাবেন; বাদ্‌শার বাইয়ানা পোশাক, পায়ে আলতা।' কেউ বললে, 'রোগা ছিপ্‌ছিপে, দিব্যি দেখতে, ঠিক যেন একটি অপ্সরা।' কেউ বললে, 'আরে না, বাদ্‌শাটা একটা কুপোর মত মোটা, ঘাড়ে গদ্দানে, গুণের মধ্যে বেশ গাইতে পারে।' কেউ বললে, 'আঃ—ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদ্‌শা পার হল, সে দিন সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলেম; বাদ্‌শা শ্যামবর্ণ, একহারা, নাকে চশমা, ঠিক আমাদের মৌলবী সাহেবের মত।' লখ্‌নৌয়ের বাদ্‌শা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় দিন কত শহর বড় গুল্‌জার হয়ে উঠলো। চোর বদমাইশরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে; দোকানদারদেরও অনেক ভাঙা পুরনো জিনিস বেধড়ক দামে বিক্রি হয়ে গেল; দুই এক খ্যাম্‌টাওয়ালী বেগম হয়ে গেলেন। বাদশা মুচিখোলার অর্দ্ধেকটা জুড়ে বস্‌লেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতর পুরে রাখে, ক্রমে তেজ মরা হয়ে গেলে খেলাতে বার করে, গবর্ণমেণ্টও সেই রকম প্রথমে বাদ্‌শাকে কিছু দিন কেল্লায় পুরে রাখলেন, শেষে বিষ দাঁত ভেঙে তেজের হ্রাস করে খেল্‌তে ছেড়ে দিলেন। বাদ্‌শা ডম্বরুর তালে খেল্‌তে লাগলেন; শহরের রুদ্দর, ভদ্দর, সেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইকেররা মাল সেজে কাঁদুনি গাইতে লাগলো—বানর ও ছাগলও জুটে গেল!

লখ্‌নৌয়ের বাদ্‌শা জমি নিলেন, দুই-এক বড়মানুষ ক্যাপলা জাল ফেল্‌লে—অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জালখানা পর্য্যন্ত উঠ্‌লো না—কেউ বললে, 'কেঁদো মাছ!' কেউ বললে, 'রাণা'! নয় 'খোটা'!

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুজুক রঙ্গে শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে ন্যাখা দিলেন। বাবু দিন কত বড় বাড় বেড়েছিলেন;—আজ একে চাবুক মারেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মারেন, আজ মেড়ুয়াবাদী খোট্টা ঠকান, কাল টুপিওয়ালা সায়েব ঠকান—শেষে আপনি ঠকলেন। জালে জড়িয়ে পড়ে বাঙালীর কুলে কালি দিয়ে চোদ্দ বৎসরের জন্যে জিঞ্জির গেলেন! কোন কোন সায়েবে পয়সার জন্যে না করেন হেন কর্ম্মই নাই, সিটি শিবকেষ্টোবাবুর কল্যাণে বেরিয়ে পড়লো—একজন 'এম্, ডি, এফ, আর, সি, এস' প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষরের খেতাবওয়ালা ডাক্তার ঐ দলে ছিলেন।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো

আমাদের শহরে বড়মানুষদের মধ্যে অনেকের অবগুণ নাই, বদ্গুণ আছে। 'ভালো কত্তে পারব না মন্দ কর্ব্ব, কি দিবি তা দে!' যে ভাষা-কথা আছে, এঁরা তারই সার্থকতা করেচেন—বাবুরা পরের ঝক্‌ড়া টাকা দিয়ে কিনে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হতে চান—অনেকে আড়ি তুলতেও এই পেশা আশ্রয় করেচেন। যদি এমন পেশাদার না থাক্‌তো, তা হলে শিবকেষ্টোর কে কি কত্তে পাত্তো? তিনি কেবল ভাজকে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টি আপনি নিতে চেষ্টা করেছিলেন বৈ তো নয়! আমাদের কল্‌কেতা শহরের অনেক বড়মানুষ যে ভাইয়ের স্ত্রীকে ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও গায়ে ফুঁ দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্চেন, কৈ আইন তাঁর কাছে কত্তে পায় না কেন? শিবকেষ্টো যেমন জাল করেছিলেন, বোধ হয় শহরের অনেক বড়মানুষের ঘরে ও রকম কত পার পেয়ে গ্যাচে ও নিত্যি কত হচ্চে—শহরের একটি কাশ্মীরী মুখ্‌খু বড়মানুষ আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, 'শহরে আমার মত অনেক ব্যাটাই আছে, কেবল আমিই ধরা পড়েচি!' শিবকেষ্টোর বিষয়েও ঠিক তাই।

জাস্টিস ওয়েল্‌স্‌

শিবকেষ্টোর মকদ্দমার মুখে জষ্টিস্‌ ওয়েল্‌স্‌ নতুন ইণ্ডেণ্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙালীদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ, সুতরাং মকদ্দমা করবার সময় যখন চার পা তুলে বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বল্‌তেন 'বাঙালীরা মিথ্যেবাদী ও বর্বরের জাত্‌।' এতে বাঙালীরা অবশ্যই বলতে পারেন, 'শতকরা দশজন মিথ্যেবাদী বা বর্বর হলে যে আশি-নব্বুইজনও মিথ্যেবাদী হবেন এমন কোন কথা নাই'—চার দিকে অসন্তোষের গুজুগাজু পড়ে গেল, বড় দলের মোড়লরা হাতে কাগজ পেলেন, 'তেঁই ঘোঁটের' মত মাতালো মাতালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গেল, শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা করে সার চার্লস কার্ঠ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হল। কিন্তু সভা কোথায় হয়! বাঙালীদের তো এক পদও 'সাধারণের' স্থল নাই! টাউন হল্‌ সায়েবদের, নিমতলার ছাদখোলা হল গবর্নমেণ্টের, কাশীমিত্তিরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনিতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচজন সায়েব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্নের নাটমন্দিরই প্রশস্ত বলে সিদ্ধান্ত হল। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো—অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌স জজের মুখরোগের চিকিৎসা করবার জন্যে সভা করা হবে! ঔষধ সাগরে রয়েচে!

শহরের অনেক বড়মানুষ—তাঁরা যে বাঙালীর ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; বাবু চুনোগলির আনড্রু পিক্রুসের পৌত্তুর বললে তাঁরা বড় খুশি হন; সুতরাং যাতে বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত, নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌সের বিপক্ষে বাঙালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গেল, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন! রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিশ পড়লো; রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, একবার কথা দিয়েচেন, সুতরাং উঁচু-দরের সুপারিশ হলেও সহসা রাজী হলেন না।

সুপারিশওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চললো। নিরূপিত দিনে সভা হল, শহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙে পড়লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনে জোড়হস্ত করা পাথরের গরুড়েরও আহ্লাদের সীমা রইল না। বাঙালীদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেচে এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। সুপারিশওয়ালা বাবুরা ও শহরের সোনার বেনে বড়মানুষরা কেবল এই সভায় আসেন নাই—সুপারিশওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। বেনেবাবুরা কোন কাজেই মেশেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই! ওয়েলস্-হুজুকের অনেক অংশে শেষ হল, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েল্‌স্‌ও ব্রেক হলেন।

টেকচাঁদের পিসী

টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের টেঁপী পিসী ওয়েল্‌সের মুখরোগের তরে মিটিং করা হয়েচে শুনে বললেন, 'ও মা, আজকাল সবই ইংরিজি কেতা! আমরা হলে মুলোমুড়ি, নারকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিম্‌কীতে দোরস্ত কত্তেম!' নারকেলমুড়ি বড় উত্তম ওষুধ হলোয়ের বাবা! আমাদের শহরের অনেক বড়মানুষ ও দুই এক জেলার ধিরাজ মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগ ভোগ করে থাকেন; দাৰ্জিলিং, সিম্‌লে, সপাটু, ভাগলপুর ও রানীগঞ্জে গিয়েও শোদরাতে পারেন না; আমরা তাঁদের অনুরোধ করি, নারকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিম্‌কীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ্!!!

পাদ্‌রি লং ও নীলদর্পণ

নীলকরী হাঙ্গাম উঠলো, শোনা গেল কৃষ্ণনগর, পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োতরা ক্ষেপেচে। কে তাদের খ্যাপালে? কি উলুইচণ্ডী? না! শ্যামচাঁদ? তবে—'মাজিস্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে' 'ইণ্ডিগো কমিশনে' 'হরিশে' 'লঙে' 'ছোট আদালতে' 'কণ্ট্রাক্টবিলে' অবশেষে গ্রাণ্টের রিজাইনমেণ্টে রোগ সারতে পারে? না। কেবল শ্যামচাঁদীরা সল্লে!!!

নীলকর সায়েবরা দ্বিতীয় রিভোলিউশন হবে বিবেচনা করে (ঠাকুরঘরে কে ? না আমি কলা খাইনি) গবর্ণমেণ্টে তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন ! রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট গোরা, গন্, বোট ও এস্পেশিয়েল কমিশনর চললো— মফস্বলে জেলে আর নিরপরাধীর জায়গা ধরে না, কাগজে হুলস্থুল পড়ে গেল ও আণ্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়লেন।

প্রজার দুরবস্থা শুনতে ইণ্ডিগো কমিশন বসলো, ভারতবর্ষীয় খুড়ীর চম্‌কা ভেঙে গেল। (খুড়ী একটু আফিম খান) বাঙালীর হয়ে ভারতবর্ষীয় খুড়ীর একজন খুড়ো কমিশনব হলেন। কমিশনে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো ; সেই সাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো ; তার দরুন নীলকর-দল হন্যে হয়ে উঠলেন,—ছাইগাদা, কচুবন, ফ্যানগোঁজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরঘরে গির্জেয়, প্যালেসে ও প্রেসে তাগ কল্লেন ! শেষে ঐ দলের একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদ্‌রি লং সায়েবকে কাম্‌ড়ে দিলে !

প্যায়দারা পর্যন্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চললেন, তুমুল কাণ্ড বেধে

উঠলো ! বাদাবুনে বাগ (প্লান্‌টার্‌স্ এসোসিয়েশন) বেগতিক দেখে নাম বদলে (ল্যাণ্ডহোলডর্‌স্ এসোসিয়েশন) তুলসীবনে ঢুকলেন, হরিশ মলেন, লঙের মেয়াদ হল, ওয়েল্‌স্ ধমক খেলেন, গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন, তবু হুজুক মিটলো না ! প্রকৃত বাঁদুরে হাঙ্গামে বাজারে নানা রকম গান উঠলো , চাষার ছেলেরা লাঙ্গল ধরে মূলো ও মুড়ি খেতে খেতে ক্ষেতে ক্ষেতে গাইতে লাগলো।

গান

সুর 'হাঃ শালার গোরু' তাল 'টিট্‌গিরি ও ল্যাজমলা।'

উঠ্‌লো সে সুখ, ঘটলো অসুখ মনে, এত দিনে।
মহারানীর পুণ্যে মোরা, ছিলাম সুখে এই স্থানে ॥
উঠ্‌লো খামার ভিটে ধান, গেল মানী লোকের মান,
হ্যান সোনার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমানে ॥

নীলকরেরা এর উত্তরে ক্যাটল ট্রেস্‌পাশ বিল পাশ করে, কেউ কোন কোন ছোট আদালতের উকিল জজেদের স্তামপীন খাইয়ে ও ঘরঘেঁষা করে, কেউ বা খাজনা বাড়িয়ে, খেঁউড়ে জিতে কথঞ্চিৎ গায়ের জ্বালা নিবারণ কল্লেন।

নীলবান্দুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হয়ে গেল, মোড়লেরা জিরেন পেলেন, ভারতবর্ষীয় খুড়ী এক মৌতাত চড়িয়ে আরাম কত্তে লাগলেন। কোন কোন আশাসোঁটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো, অনারেরী চৌকিদারী, তথা ছেলেপুলের আসেসরী ও ডেপুটি মেজেস্টরীর জন্যে সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। তথাস্তু!!!

শ্যামচাঁদের অসহ্য টর্‌চরে ভূত পালায়, প্রজারা ক্ষেপে উঠবে কোন্ কথা! মিউটিনি ও ব্ল্যাক অ্যাক্‌টের সভাতে তো 'শ্রীবৃদ্ধিকারীরা' চটেই ছিলেন, নীলবান্দুরে হাঙ্গামে সেইটি বদ্ধমূল হয়ে পড়লো। বড় ঘরে সতীন হলে, বড় বৌ ও ছোট বৌকে তুষ্ট কত্তে কর্তা ও গিন্নীর যেমন হাড় ভাজা ভাজা হয়ে যায়, 'শ্রীবৃদ্ধিকারী' সুইপিং ক্লাস ও নেটিভ কমিউনিটিকে তুষ্ট কত্তে গিয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গভর্নমেণ্টও সেই রকম অবস্থায় পড়লেন।

রমাপ্রসাদ রায়

হুতোমের পাঠকগণ! আমরা আপনাদের পূর্বেই বলে এসেচি যে 'সময় কারও হাত ধরা নয়; সময় জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবের পরমায়ুর ন্যায়; কারুরই অপেক্ষা করে না।' দেখতে দেখতে আমরা বড় হচ্চি, দেখতে দেখতে বছর ফিরে যাচ্চে; কিন্তু আমাদের প্রায় মনে পড়ে না যে 'কোন্ দিন যে মত্তে হবে তার স্থিরতা নাই।' বরং যত বয়স হচ্চে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্চে, শরীর তোয়াজে রাখচি, আরশি ধরে শোন নুটির মত পাকা গোঁপে কলপ দিচ্চি, সিমলের কালাপেড়ের বেহদ্দ বাহারে বঞ্চিত হতে প্রাণ কেঁদে উঠচে। শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিয়েচে, চশমা ভিন্ন দেখতে পাইনে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েচে, বরং ক্রমে বাড়চে বই কমচে না। এমন কি অমর বর পেয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে চিরজীবী হলেও মনের সাধ মেটে কি না সন্দেহ! প্রচণ্ড রৌদ্রক্লান্ত পথিক অভিষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌঁছবার জন্যে একমনে হন্ হন্ করে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গেঁড়িভাঙা কেউটে রাস্তায় শুয়ে

আছে দেখতে পান, তা হলে তিনি যেমন চম্‌কে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখনো কখনো মহাবিপদে ঐ রকম অবস্থায় পড়ে থাকি, তখন এই দগ্ধ হৃদয়ের চৈতন্য হয়! উল্লিখিত পথিকের হাতে সে সময় একগাছা মোটা লাঠি থাক্‌লে তিনি যেমন সাপটাকে মেরে পুনরায় চলতে আরম্ভ করেন, আমরাও মহাবিপদে প্রিয় বন্ধুদের পরামর্শ ও সাহায্যে তরে যেতে পারি; কিন্তু যে হতভাগ্যের এ জগতে বন্ধু বলে আহ্বান করবার একজনও নাই, বিপৎপাতে তার কি দুর্দশাই না হয়! তখন তার এ জগতে ঈশ্বরই একমাত্র অনন্যগতি হয়ে পড়েন। ধর্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতি—এমনি গম্ভীর ভাব, যে তার প্রভাপ্রভাবে, ভয়ে ভণ্ডামো, নাস্তিকতা ও বজ্জাতি সরে পালায়—চারিদিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বইতে থাকে—তখন বিপদ্‌সাগর জননীর স্নেহময় কোল হতেও কোমল বোধ হয়। হায়! সেই ধন্য, যে নিজ বিপদ সময়ে এই বিমল আনন্দ উপভোগ করবার অবসর পেয়ে আপনা আপনি ধন্য ও চরিতার্থ হয়েচে। কারণ প্রবল আঘাতে একবার পাষাণের মর্ম ভেদ কত্তে পাল্লে চিরকালেও মিলিয়ে যায় না।

ক্রমে আমরাও বড় হয়ে উঠলেম—ছলনা কুআশায় আবৃত, আশার পরিসর শূন্য, সংসারসাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো। একদিন আমরা কতকগুলি সমবয়সী একত্র হয়ে একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক কচ্চি, এমন সময় আমাদের দলের একজন বলে উঠলেন, 'আরে আর শুনেচ? রমাপ্রসাদবাবুর মার সপিণ্ডীকরণের বড় ধুম! এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ; শহরের সমস্ত দলে, উদিকে কাশী কর্ণাট পর্যন্ত পত্র দেওয়া হবে।' ক্রমে আমরা অনেকের মুখেই শ্রাদ্ধের নানা রকম হুজুক শুন্‌তে লাগলেম। রমাপ্রসাদবাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি, মার সপিণ্ডীকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ করবেন শুনে কার না কৌতূহল বাড়ে! সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধের আনুপূর্বিক নক্‌শা নিতে লাগলেম।

ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সংক্ষেপ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। ক্রিয়ে-বাড়িতে স্যাকরা বসে গেল—ফলারে বামুনরা অ্যাপ্রেন্টিস নিতে লাগলেন। সংস্কৃত কালেজের ফলারের প্রোফেসর রকমারি ফলারের লেক্‌চার দিতে আরম্ভ কল্লেন—বৈদিক ছাত্রেরা ভলমন্‌স্‌ নোট লিখে ফেললে। এদিকে চতুষ্পাঠীওয়ালা ভট্টাচার্যরা চলিত ও অর্ধপত্র পেতে লাগলেন; অনাহূত চতুষ্পাঠীহীন ভট্টাচার্যরা সুপারিশ

ও নগদ অর্থ বিদায়ের জন্যে রমাপ্রসাদবাবুর বাড়ি নিমতলা ও কাশী মিত্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুললেন—সেথায় বা কটা শকুনি আছে! এঁদের মধ্যে অনেকের চতুষ্পাঠীতে সংবৎসর ষাঁড়ে হাগে, সরস্বতী পুজার সময় ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গদেশীয় ছাত্র সাজেন, শোলার পদ্ম ও রাংতার সাজওয়ালা ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতীর অধিষ্ঠান হয়; জানিত ভদ্দর লোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পেটে।

ভট্‌চায্যি মশাইদের ছেলেবেলা যে ক-দিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপর এজন্মে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, কেবল সংবৎসর অন্তর একদিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের জন্যে!

পাঠকগণ! এই যে উর্দি ও তক্‌মাওয়ালা বিদ্যালংকার, ন্যায়ালংকার, বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখচেন, এঁরা বড় ফ্যালা যান না, এঁরা পয়সা পেলে না করেন হেন কর্মই নাই! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে ভেবে মিলিয়ে যাচ্চেন! পয়সা দিলে বানরওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোশাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্যন্ত সেজে নাচেন। যত ভয়ানক দুষ্কর্ম এই দলের ভেতর থেকে বেরোবে, দায়মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবেন না।

আগামী কল্য সপিণ্ডন। আজকাল শহরের দলপতিদলে অনেকেই কুলপানা চক্করের দলে পড়েচেন, নামটা ঢাকের মত কিন্তু ভেতরটা ফাঁক!—'রমাপ্রসাদ বাবু সদরের প্রধান উকিল, সাহেব সুবোদের বাবুর প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ, তাতে আরও কত কি হয়ে পড়বেন, সুতরাং রমাপ্রসাদবাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র দিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভালো হয় না। কিন্তু রমাপ্রসাদবাবুও * * *' প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চলতে লাগলো। দুই এক টাট্‌কা দলপতিরা (জোর কলুমে, মান অপমানের ভয় নাই) রমাপ্রসাদবাবুর তোয়াক্কা না রেখে আপন আপন দলে প্রোক্লেমেশন্ দিলেন, প্রোক্লেমেশন্ দলস্থ ভট্টাচার্যদলে বিতরণ হতে লাগলো, অনেকে দু-নৌকায় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন—শান্‌কীর ইয়ারেরা 'বারে বারে মুরগী তুমি' দলে ছিলেন, চিরকাল মুখ পুঁচে চলেচে, এইবার মহাবিপদে পড়তে হল, সুতরাং মিত্তির খুড়ো লিভ্ নিয়ে হাওয়া খেতে যান। চাটুয্যে শয্যাগত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোক্লেমেশন জুরির সমন ও সফিনে হতেও ভয়ানক হয়ে পড়লো, সে এই—

"শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

অশেষ শাস্ত্ররত্নাকর পারবর পরম পুজনীয়—

শ্রীল

ভট্টাচার্য মহাশয়গণ—

শ্রীচরণেষু

ধর্ম—

সেবক শ্রী* চন্দর দাস ঘোষ

সাষ্টাঙ্গে শত সহস্র প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদনং কার্যনঞ্চাগে শ্রীশ্রীভট্টাচার্য মহাশয়দিগের আশীর্বাদে এ সেবকের প্রাণগতিক কুশল পরে যে হেতুক ৺রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায় স্বীয় মাতা ঠাকুরানীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে মহাসমারোহ করিতেছেন এই দলের বিখ্যাত কুলীন ও আমার ভগ্নীপতি বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর সম্যক্ প্রতীয়মান হইয়া জানিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু শহরের সমস্ত দলেই পত্র দিবেন সুতরাং এ দলেও পত্র পাঠাইবার সম্পুর্ণ সম্ভাবনা কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী৺সভার দলের অনুগত দলের সহিত রায় মজকুরের আহার ব্যাভার চলিত নাই সুতরাং তিনি পত্র পাঠাইলেও আপনারা তথায় সভাস্থ হইবেন না।

শ্রী* চন্দর দাস ঘোষ।

সম্মতঃ সাং—সুড়ীঘাটা।

শ্রীহবীশ্বর শর্মাঃ ন্যায়লংকারোপাধীকঃ

বাব্যঃ সভাপণ্ডিতঃ"

প্রোক্লোমেশন্ পেয়ে ভট্‌চায্যি ও ফলারেরা ডুব্ মাল্লেন; কেউ কেউ ফল্গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগলেন, ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্যি নাই যে টের পান; তবুও অনেক জায়গায় চৌকি, থানা ও পাহারা বসে গেল, কিছুতেই কিছু কত্তে পাল্লেন না, টাকার খোস্‌বো প্যাঁজ রসুনের গন্ধ ঢেকে তুল্লে—শ্রাদ্ধসভা পবিত্র হয়ে উঠ্‌লো, বাগবাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর শ্যামসুন্দর পর্যন্ত ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন! শ্রাদ্ধের দিন সকালবেলা রমাপ্রসাদবাবুর বাড়ি লোকারণ্য হয়ে গেল, গাড়িবারান্দা থেকে বাবুর্চীখানা পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল ধরলো, এমন কি শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রায় জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখতেও এত লোকারণ্য হয় না!

সপিণ্ডনের দিন সকালে রমাপ্রসাদবাবু বারাণসী গরদের জোড় পরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে পড়লেন। বেলার সঙ্গে সভার জনতা বাড়তে লাগলো, একদিকে রাজভাটেরা সুর করে বল্লালের গুণগরিমা ও আদিশূরের গুণকীর্তন কত্তে লাগলো, একদিকে ভট্টাচার্যদের তর্ক লেগে গেল, দু-দশজন ভেতরমুখো কুলীন দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগলেন, দল দল কেত্তন আরম্ভ হল, খোলের চাঁটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং রুমের কাচের গ্লাস ও ডিশেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো—বৈমাত্র ভাই ধুম করে মার শ্রাদ্ধ কচ্চেন দেখে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন হিংসাতেই ব্রাহ্মধর্ম কাঁদ্‌তে লাগলেন, দেখে অ্যাম্‌বিশন হাসতে লাগলেন!

ক্রমে মালাচন্দন ও দানসামগ্রী উচ্ছুগ্‌গু হলে সভা ভঙ্গ হল। কেত্তন বিদায় হলেন, ব্রাহ্মণভোজন আরম্ভ হল। কলকেতার ব্রাহ্মণভোজন দেখতে বেশ,—হুজুরেরা আঁতুড়ের ক্ষুদে মেয়েটিকেও বাড়িতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে, ফলারের দিন সেগুলি সব বেরোবে—এক এক জন ফলারমুখো বামুনকে ক্রিয়ে বাড়িতে ঢুকতে দেখলে হটাৎ বোধ হয় যেন গুরুমশাই পাঠশাল তুলে চলেচেন! কিন্তু বেরোবার সময় বোধ হয় এক একটা সন্দার ধোপা—লুচিমোণ্ডার মোটটি একটা গাধায় বইতে পারে না! ব্রাহ্মণরা সিকি, দু-আনি ও আদুলি দক্ষিণে পেয়ে বিদেয় হলেন; দই মাখানো এঁটো কলাপাত, ভাঙা খুরি ও আঁবের আঁটির নীলগিরি হয়ে গেল! মাছিরা ভ্যান ভ্যান করে উড়্‌তে লাগলো—কাক ও কুকুররা টাঁকতে লাগলো,—সামিয়ানায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গ্যাচে! সুতরাং জল সপ্‌সপানি ও লুচি মোণ্ডা দই ও আঁবের চপটে এক রকম ভ্যাপ্‌সো গন্ধে বাড়ি মাত্তিয়ে তুললে—সে গন্ধ ক্রিয়েবাড়ির ফেরত লোক ভিন্ন অন্যে হঠাৎ আঁচতে পারবেন না।

এদিকে বৈকালে রাস্তায় 'কাঙালী' জম্‌তে লাগলো, যত সন্ধ্যা হতে লাগলো ততই অন্ধকারের সঙ্গে কাঙালী বাড়তে লাগলো—ভারী, দোকানদার, উড়ে বেহারা, রেও ও গুলিখোরেরা কাঙালীর দলে মিশতে লাগলেন; জনতার ও! ও! রো! রো! শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো—রাত্তির সাতটার সময় কাঙালীদের বিদেয় করবার জন্যে প্রতিবাসী ও বড় বড় উঠানওয়ালা লোকেদের বাড়ি পোরা হল; শ্রাদ্ধের অধ্যক্ষরা থলো থলো সিকি, আদুলি, দু-আনি ও পয়সা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন; চল্‌তি মশাল, লণ্ঠন ও 'আও!' 'আও!' রাস্তায় রাস্তায় কাঙালী ডেকে বেড়াতে লাগলো; রাত্তির তিনটে

পর্যন্ত কাঙালী বিদেয় হল। প্রায় ত্রিশ হাজার কাঙালী জমেছিল, এর ভিতর অনেকগুলো গর্ভবতী কাঙালিনীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নম্বরে বিস্তর বাড়ে!

কাঙালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের জলপান। ফলারে কেউই ফ্যালা যায় না; বামুন ও রেওদের মধ্যে যেমন তুখোড় ফলারে আছে, কায়েত নবশাখ ও বদ্দিদের মধ্যেও ততোধিক। বরং কতক বিষয়ে এঁদের কাচে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কল্কে পায় না!

শহরের কারু বাড়ি কোন ক্রিয়েকর্ম উপস্থিত হলে বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চাপকান, পায়জামা, টুপি ও পেটি পরে, হাতে লাল রুমাল ঝুলিয়ে—ঠিক যাত্রার নকীব সেজে দলস্থ ও আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্তন্নো কত্তে বেরোন। এর মধ্যে বড়মানুষ বা শাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেশাদার নেমন্তন্নে বামুন থাকে। অনেকের বাড়ির সরকার বা দাদাঠাকুর গোছের পুজুরী বামুনেও চলে। নেমন্তন্নে বামুন বা সরকার রাম গোছের এক ফর্দ হাতে করে কানে উডেন্ প্যান্সিল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তন্নো সেরে যান—ছেলেটি কেবল টুকাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

আজকাল ইংরেজি কেতার প্রাদুর্ভাবে অনেকে সাপ্টা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক্ করেন না। কেউ ছেলেপুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবার সময় ক্রিয়েবাড়ি হয়ে বেড়িয়ে যান—কিছু আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে ভয়ানক রোগের ভান করে কাটিয়ে ছ্যান, অথচ বাড়িতে এক জোড়া কুম্ভকর্ণের আহার তল পেয়ে যায়—হাতীশালের হাতী ও ঘোড়াশালের ঘোড়া খেয়েও পেট ভরে না!

পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলারদাস। লোহার সঙ্গে চুম্বুক পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচিরও সেইরূপ—তোমার বাড়িতে ফলারটা আসটা জম্‌লে

অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না—আমরা মুন্‌কে রঘুর ভাই! ফলারের নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্যন্ত যাই! সে বার মৌলুবী হালুম হোসেন খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি। হিন্দুধর্ম ছাড়া কাণ্ড বিধবা বিয়েতেও পাত পাতা গিয়েচে। আর কল্‌কেতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফার্স্টের বাড়িতে যে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্তর হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি! ভালো কথা! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জন দশ-বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত তাজিয়া পড়তে দেখতে পাই, বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয়, পোশাকী ব্রাহ্ম! না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তর ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট আছে, যদি ইউনিভার্‌সিটিতে বি, এ, ও বি, এলের মত ফলারের ডিক্রী স্থির হয়, তা হলে আমরা তার প্রথম ক্যান্‌ডিডেট্!

রামপ্রসাদবাবুর মার সপিণ্ডনের জলপানে আড়ম্বর বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচারও উত্তম রকম আহরণ হয়। শহরের জলপান দেখতে বড় মন্দ নয়, এক তো মধ্যাহ্নভোজন বা জলপান বাস্তিব দুই প্রহর পর্যন্ত ঠেল মারে, তাতে নানারকম জানোয়ারের একত্র সমাগম! যাঁরা আহার কত্তে বসেন, সেগুলির পা প্রথম ঘোড়ার মত নালবাঁধানো বোধ হবে, ক্রমে সমীচীনরূপে দেখলে বুঝতে পারবেন যে কর্মকর্তা ও ফলারের সঙ্গীদেব প্রতি এমনি বিশ্বাস যে জুতো জোড়াটি খুলে বস্‌তে ভরসা হয় না!

শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হল। কুলীনরা পর্যায় মত রুই মাছের

মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আদবুড়ো আফিমখোর কুলীনের মাছের মুড়ো চিবানো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগলো। এক এক জনের পাত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে! এই প্রকারে প্রায় পনের দিন সমারোহের পর রমাপ্রসাদের মার সপিণ্ডনের ধুম চুকলো--হুজুকদারেরা জিরুতে লাগলেন।

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিরা সভাস্থ হন নাই, তারা আপনার আপনার দলে ঘোঁট পাড়িয়ে দিলেন—অনেক ভট্টচায্যি বিদেয় নিয়ে ফলার মেরে এসেও শেষে শ্রীশ্রী৺ধর্মসভার উমেদাবের প্রপৌত্তুরদের দলের দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সামনে দিব্যি কত্তে লাগলেন যে তিনি অ্যাদ্দিন শহরে আচেন কিন্তু রমাপ্রসাদ রায় যে কে, তাও তিনি জানেন না, তিনি সুদ্ধ বাবুই জানেন! আর তাঁর ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মরবার সময় বলে গিয়েচেন্ন যে 'ধর্ম অবতার! আপনার মত লোক আর এ জগতে নাই!' এ সওয়ায় অনেক শূন্য উপাধিধারী হুজুরেরা ধরা পড়লেন, গোবর খেলেন শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কল্লেন ও ভুরু কামালেন।

কল্‌কেতায় প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালী, উতোরপাড়া, অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্টচায্যিরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন, তার পর ক্রমে গাঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেকে গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সে দিন শয্যাগত ছিলাম!

যতদিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব থাকবে, তত দিন বাঙালীর ভদ্রস্থতা নাই; গোঁসাইরা হাড়ী, মুচি ও মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটা কত হতভাগা গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন; এঁরা এক একজন হারামজাদকি ও বজ্জাতির প্রতিমূর্তি, এদিকে এমনি সজ্জাগজ্জা করে বেড়ান যে হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে,—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় অতি নিরীহ ভদ্রলোক! বাস্তবিক, সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো।

রসরাজ ও যেমন কর্ম তেমনি ফল

রমাপ্রসাদ রায়ের মার সপিণ্ডনে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোনখানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠ্লো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক্ হলেন। মামী ভাগ্নেকে ছাঁটলেন—ভাগ্নে মামীর চির-অন্নপালিত হয়েও চিরজন্মের কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়লেন! আমরা যখন ইস্কুলে পড়তুম, তখন শহরের এক বড়মানুষ সোনার বেনেদের বাড়ির শম্ভুবাবু বলে একজন আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন। এক দিন তিনি কথায় কথায় বললেন যে 'কাল ড়াত্রে আমি ভাই আমার স্ত্রীকে বর ঠাট্টা কড়েচি, সে আমায় বললে, তুমি হনুমান্, আমি অমনি ফস্ কড়ে বললুম তোড শ্বশুড় হনুমান্।' ভাগনে বাবুও সেই রকম ঠাট্টা আরম্ভ করলেন। 'রসরাজ' কাগজ পুনরায় বেরুলো; খেঁউড় ও পচালের স্রোত বইতে লাগলো। এরি দেখাদেখি একজন সংস্কৃত কালেজের কৃতবিদ্য ছোকরা ব্রাহ্মধর্ম ও কালেজ এড়ুকেশন মাথায় তুলে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নামে 'রসরাজের' জুড়ি এক পচাল-পোরা কাগজ বার কল্লেন—বসরাজ ও তেমনি ফলে লড়াই বেধে গেল। দুই দলে কৃতাস্ত্র ও সেনা সংগ্রহ করে সমর-সাগরে অবতীর্ণ হলেন,—ইস্কুল বয়েরা ভূরি ভূরি নির্বুদ্ধি দলবল সংগ্রহ করে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ ঘটনার ন্যায়
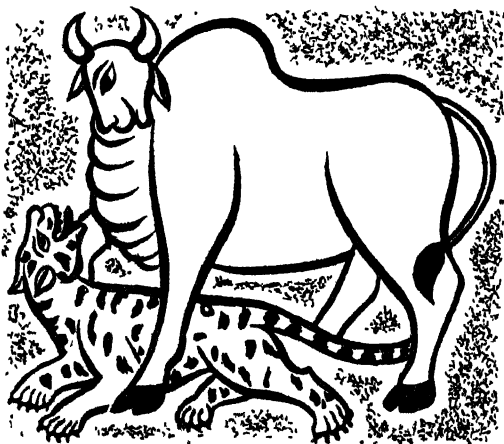
ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন—দুর্বুদ্ধিপরায়ণ কেরানী, কুটেল ও বাজে

লোকেরা সেই কদর্য রস পান করবার জন্যে কাক, কবন্ধ ও শৃগাল শকুনির মত রণস্থল জুড়ে রইলো। রসরাজ ও তেমনি ফলের ভয়ানক সংগ্রাম চলতে লাগলো—'পীর গোরাচাঁদের ম্যালা' 'পরীর জন্মবিবরণ' 'ঘোড়া ভূত' 'ব্রহ্মদৈত্যের কথোপকথন' প্রভৃতি প্রস্তাবপরিপুর্ণ রসরাজ প্রতিদিন পাঁচ শ! হাজার! দু-হাজার! কাপি নগদ বিক্রি হতে লাগলো! কিন্তু 'ব্রাহ্ম-ধর্ম' মাসে একখানাও ধারে বিক্রি হয় কি না সন্দেহ; 'তিলোত্তমা' ও 'সীতার বনবাসের' খদ্দের নাই! কিছু দিন এই প্রকার লড়াই চল্‌চে, এমন সময় গবর্নমেণ্ট বাদী হয়ে কদর্য প্রস্তাব লিখন অপরাধে রসরাজ সম্পাদকের নামে পুলিসে নালিশ কল্লেন; 'যেমন কর্ম'ও পাছে তেমনি ফল পান এই ভয়ে গা ঢাকা দিলেন; 'রসরাজের' দোয়ার ও খুলীরে, মূল গায়েনকে মজলিশে রেখে 'চাচা আপনা বাঁচা' কথাটি স্মরণ করে মের্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলে। ভাগনে বাবু (ওরফে মিস্তির খুড়ো) সফিনের ভয়ে অন্দর মহলের পাইখানা আশ্রম কল্লেন—গিরিবর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন চামর ও নূপুর নিয়ে তিন মাসের জন্যে হরিণবাড়ি ঢুকলেন। 'পীর গোরাচাঁদের' বাকি গীত সেইখানে গাওয়া হল। পাতরভাঙা হাতুড়ির শব্দ, বেতের পটাং পটাং ও বেড়ির ঝুমঝুমানি মন্দিরে ও মৃদঙ্গের কাজ কল্লে—কয়েদীরা বাজে লোক সেজে 'পীরের গীত' শুনে মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিলে; 'খেঁদৈম দই রামকান্ত বিকারের ব্যালা গোবর্ধন'—যে ভাষা কথা আছে, ভাগ্নে বাবু (ওরফে মিস্তির খুড়ো) ও রসরাজ সম্পাদকে সেইটির সার্থকতা হল। আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়লেম, চশমা ভিন্ন দেখতে পাইনে।

বুজরুকি

পাঠক! আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্থ মুখ্‌খী কুলীন, দেড়শ ছিলিম গাঁজা প্রত্যহ জলযোগ হয়ে থাকে, থাক্‌বার নির্দিষ্ট বাড়ি ঘর নাই, শহরে খান্‌কী মহলে অনেকের সঙ্গে আলাপ থাকায় শোবার ও খাবার ভাবনা নাই, বরং আদর করে কেউ 'বেয়াই' কেউ 'জামাই' ডাকতো। আমাদের খুড়ো ফলার মাত্রেই পাদধুলো স্থান ও লুচিটে সন্দেশটা বেঁধে আনতেও কসুর করেন না; এমন কি তাগে পেলে চলনসই জুতোজোড়াটাও ছেড়ে

আসেন না। বলতে কি আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো এরকম সবলোট্ গোছের ভদ্দর লোক! খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর বললেন যে আর শুনেছ আমাদের সিমূলে পাড়ায় এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী এসেচেন— তিনি সিদ্ধ,—তিনি সোনা তৈরি কত্তে পারেন—লোকের মনের কথা গুণে বলেন—পারাভস্ম খাইয়ে সে দিন গঙ্গাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েছেন, ভারী বুজরুক! কিন্তু আমরা ক-বার কটি সন্ন্যাসীর বুজরুকি ধরেচি, গুটিকত ভূতচালায় ভূত উড়িয়ে দিয়েচি, আর আমাদের হাতে একটি জোচ্চরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।

যখন হিন্দুধর্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ, কিমিয়া ও ভূতত্ত্ব জান্‌তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল। আজকাল ইংরেজি লেখাপড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে, কিন্তু কল্‌কেতা শহরে না দেখা যায়, এমন জিনিসই নাই; না আসেন, এমন দেবতাই নাই; সুতরাং কখনো কখনো 'সোনা করা' 'ছেলে করা' 'নিরাহার' 'ভূত নাবানো' 'চণ্ডুসিদ্ধ' প্রভৃতিরা পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজরুক দ্যাখান শেষে কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।

হোসেন খাঁ

বছর চার-পাঁচ হল, এই শহরে হোসেন খাঁ নামে এক মোছলমান বহু কালের পর ঐ রঙ্গে ভয়ানক আড়ম্বরে দ্যাখা দ্যান—তিনি হজরত জিনিয়াই সিদ্ধ! (পাঠকরা আরব্য উপন্যাসের আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন)—'যা মনে করেন, সেই জিনিসই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন, বাক্সের ভেতর থেকে ঘড়ি, আংটি, টাকা উড়িয়ে দ্যান, নদীজলে চাবির থলো ফেলে দিয়ে জিনির দ্বারা তুলে আনান' প্রভৃতি নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম কত্তে পারেন।

ক্রমে শহরে সকলেই হোসেন খাঁর কথার আন্দোলন কত্তে লাগলেন—ইংরেজি কেতার বড় দলে হোসেন খাঁর খবর হল। হোসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্সের ভেতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইলসনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আন্‌লেন, বোতল বোতল শ্যামপিন্,দোনা দোনা

গোলাবি খিলি ও দালিম, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি হরেকরকম খাবার জিনিস উপস্থিত কল্লেন। কাল—রায় বাহাদুরের বাড়িতে কমলালেবু, বেলফুলের মালা, বরফ ও আচার আন্‌লেন—যাঁরা পরমেশ্বর মান্‌তেন না, তাঁরাও হোসেন খাঁকে মান্‌তে লাগলেন। ভাষায় বলে 'পাথরে পুজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে'। ক্রমে হোসেন খাঁ বড় বড় কাশ্মীরী উল্লুক ঠকাতে লাগলেন!

অনেক জায়গায় খোরাকি বরাদ্দ হল। বুজরুকি দ্যাখবার জন্যে দেশ দেশান্তর থেকে লোক আস্‌তে লাগ্‌লো—হোসেন খাঁর প্রিমিয়ম্‌ বেড়ে গেল।

জুচ্চুরি চিরকাল চলে না। 'দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের,' ক্রমে দুই এক জায়গায় হোসেন খাঁ ধরা পড়তে লাগ্‌লেন—কোথাও ঠোনাটা ঠানাটা, কোথাও কান-মলা, শেষ প্রহার পর্যন্ত বাকি রইল না। যাঁরা তাঁরে পূর্বে দেবতানির্বিশেষে আদর করেছিলেন, তাঁরাও দু-এক ঘা দিতে বাকি রাখলেন না; কিছু দিনের মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হোসেন খাঁ পৌত্তলিকের শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়ের অবস্থায় পড়লেন; যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁরাই দাগী করে বার করে দ্যান, শেষে সরকারী অতিতশালা আশ্রয় কল্লেন—হোসেন খাঁ জেলে গেলেন! জিনি পাতাল আশ্রয় কল্লেন।

ভূত নাবানো

আর একবার যে আমরা ভূত নাবানো দেখেছিলেম, সেও বড় চমৎকার! আমাদের পাড়ার এক স্যাকরাদের বাড়িতে একজনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; স্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং রোগের চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি কল্লে না, ইংরেজি ডাক্তার বদ্দি ও হাকিমের মেলা করে ফেললে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হল, কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি

হচ্চে দেখে বাড়ির মেয়ে মহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সস্তেন—কাল ভৈরবের স্তব পাঠ—তুকৃতাক্—সাফরিদ্—নারাণ—বালওড়—বাল্‌সী—শোপুর—হুলপুর ও হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্নামেত্তো ও মাদুলি ধারণ হল—তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গেল—বাড়ির বড় গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গেলেন—শেষে একজন ভূতচালা আনা হয়।

ভূতচালার ভূতের ডাক্তারি পর্যন্ত করা আছে। আজকাল দু-এক বাঙালী ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেশেন্টের বাড়ি ভূত সেজে স্থাখা স্থান—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মশারি গায়ে কথনো বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার-পাঁচজন রোজায় ধরাধরি করে আন্‌তে হয়। এঁরা কল্‌কেতা মেডিকেল কালেজের এজুকেটেড ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আস্‌বার প্রোগ্র্যাম স্থির হল—আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নাববেন, পাড়ার দু-চার বাড়িতে খবর দেওয়া হল—ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কুঠিওয়ালারা ঘরে ফিল্লেন—বারফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহরা উত্তরাঢ়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) শেতল খেলেন, গির্জের ঘড়িতে টুং টাং ঢং করে নটা বেজে গেল, গুম্ করে তোপ পড়্‌লো। ছেলেরা 'ব্যোম্ কালী কল্‌কেতাওয়ালী' বলে হাততালি দে উঠ্‌লো—ভূতনাবানো আসরে নাবলেন।

আমাদের প্রতিবাসী ভূত নাবানোর কথা প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নীদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্যে আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই; বড়বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই, ক্ষীরের নানা রকম পেয় ও লেহ্যরা পদার্পণ করেন—বোধ হয়, আমাদের মত প্রকৃত ফলারের দশজনে তাঁদের শেষ কত্তে পারে না, রোজা ও তাঁর দুই চেলায় কি করবেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটি পিঁড়েয় বসে ঘরের ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগ্‌লেন—অনেকের আপাদমস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—দুই-একজন কলেজবয় ও মোটা মোটা লাঠিওয়ালা নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মেছিল, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গেল।

রোজার সঙ্গে দুটি চেলা মাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাল্লিশ ভূত দেখবার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আস্‌তে অস্বীকার করেছিলেন, তদুপলক্ষে রোজাও 'কাল ও ক্রিশ্চানীর' উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কত্তে ভোলেন

নাই—শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবার সম্মতিতে রোজা ভূত আন্‌তে রাজী হলেন—চেলারা খাবার দাবার সাজানো থালা ঘেঁষে বস্‌লেন, দরজায় হুড়কো পড়লো—আলো নিবিয়ে দেওয়া হল; রোজা কোশাকুশি ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাকৃতে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বারোইয়ারির গুদোমজাত সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম!

পাঠক! আপনার স্মরণ থাকৃতে পারে, আমরা পুর্বেই বলেচি যে, আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্নীর ভয় নিবারণের জন্যে একটি ছোট জয়ঢাকের মত মাদুলিতে ভূকৈলেসের মহাপুরুষের পায়ের ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে ছান—তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটি বারো রকমারি পদক মাদুলি ছিল, দুটি বাগের নখ ছিল, আর কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চামড়াও কোমরের গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুর মত কবচ ও তারকেশ্বরের উদ্দেশে সোনার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেবেলা আমাদের একবার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে একটি চোরের সিঁদের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট্ থাকে, জটটি তেল ও ধুলোতে জড়িয়ে গিয়ে রামছাগলের গলার ঝুম্‌ঝুমীর মত ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যাম্‌বিশনের দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে একখানা ছাবানো হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি; তাতেই শুন্‌লেম যে, আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হল, সুতরাং তারই কিছু পুর্বে ইস্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দশা শুনে সেগুলি খুলে ফেলেছিলেম, আজ সেগুলির আবার স্মরণ হল। মনে করলেম যদি ভূত নাবানো সত্যিই হয়, তাহলে সেইগুলি পরে আস্‌তে পাল্লে ভূতে কিছু কত্তে পারবে না—এই বিবেচনা করে সেইগুলির তত্ত্ব করলেম, কিন্তু পাওয়া গেল না—সেগুলি আমাদের পৌত্তুরের ভাতের সময় একটা চাকর চুরি করে; চুরিটি ধরবার জন্যে চেষ্টারও ক্রুটি হয়নি—গিন্নী শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন, ক্ষেপীর মা বলে আমাদের বহুকালের এক বুড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়—জান গুণে বলে দেয় যে 'চোর বাড়ির লোক, বড় কালোও নয় বড় সুন্দরও নয়—শ্যামবর্ণ, মানুষটি একহারা, মাজারি গোঁপ, মাথায় টাক থাকৃতেও পারে, না থাকতেও পারে।' জানের গোনাতে আমাদের ও চাকরটিকেই বোঝায়, সুতরাং চাকরকেই

চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, সুতরাং সে মাদুলিগুলি পাওয়া গেল না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠ্‌লো।

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না, এটিরও নিশ্চয় নাই—সে দিন কল্‌কেতার ব্রাহ্মসমাজের একজন ডাইরেক্‌টরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানা দেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ানো, সরষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পড়া দিতে, তবে ভালো হয়—অনেক ব্রাহ্মণ বাড়িতে ভূতচতুর্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়।

এদিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাকৃতে ডাকৃতে ভূতের আসবার পূর্বলক্ষণ হতে লাগ্‌লো; গোহাড়, ঢিল, ইঁট ও ছুতো হাঁড়ি বাড়ির চতুর্দিকে পড়তে লাগ্‌লো, ঘরের ভেতর গুপ্‌ গুপ্‌ করে যেন কে নাচে বোধ হতে লাগলো, খানিকক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস্‌ করে একটা শব্দ হল, ভূতের বসবার জন্যে ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হল সেইখানি দু-চির হয়ে ভেঙে গেল—রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—শ্রীযুত এসেচেন!

আমরা ছেলেবেলা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম যে, ভূতে ও পেত্নীতে খোনা কথা কয়, সেটি আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; আজ তার পরীক্ষা হল—ভূত পিঁড়ে ফাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কলেজবয়দের দলের দুই একজনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের নাস্তিক ও ক্রিশ্চান বলে গাল দিলেন, শেষে ভূতত্বনিবন্ধন ঘাড় ভাঙবার ভয় পর্যন্ত দ্যাখাতে ত্রুটি করেন নাই; ভূতের খোনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কর্তা বড় ভয় পেলেন, জোড়হাত করে (অন্ধকারে জোড়হাত দেখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্যি দেখতে পান, সুতরাং কর্মকর্তা অন্ধকারেও জোড়হস্তে কথা কয়েছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হল) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের মত যা ধরেন, তার সমূলোচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হল না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্ঠীবাটায় আগত নূতন জামাইয়ের মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগ্‌লেম!

লুচির চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপটা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থাম্‌তে প্রায় আদ ঘণ্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক

খাচ্চেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো রুগীর বমির ভূমিকার মত উকির শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমে উকির চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়্‌লো—বমি! হুড় হুড় করে বমি! গৃহস্থ মনে করলেন ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন, সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চেলা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যাচেন—আমরা পুর্ব্বে শুনিনে যে গেরস্তর অগোচরে একজন মেডিকেল কালেজের ছোকরা ভূতের জন্যে সংগৃহীত উপচারে টারটামেটিক্‌ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, রোজা ও চেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দশা; সুতরাং ভূত নাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উপে গেল! সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির করলেম যে, ইংরাজি ভূতেদের কাছে দিশী ভূত খবরে আসে না!

এ সওয়ায় আমরা আরও দু-চার জায়গায় ভূত নাবানো দেখেচি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, 'ভূত নাবানো' ও 'হোসেন খাঁ' কেবল জুচ্চুরি ও হুজুকের আনুষঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ করি।

নাককাটা বঙ্ক

হরিভদ্দর খুড়োর কথামত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরি জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিমলে পাড়ার বঙ্কবেহারিবাবুর বাড়িতে গেলুম, বেহারিবাবু উকিলের বাড়ির হেড্‌ কেরানী—আপনার বুদ্ধি ও কৌশলবলেই বাড়ি ঘর দোর ও বিষয় আশয় বানিয়ে বারো মাস ঘায়ে ঘোয়ে ফেরেন—যে রকমে হোক কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য!

বঙ্কবেহারিবাবু ছেলেবেলায় মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্‌বিরে বিলক্ষণ গাফিলি হয়। এক দিন মামার বাড়ি খেলা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভেতর পড়ে যান—তাতে নাকটি কেটে যায়, সুতরাং সেই অবধি সববয়সীরা আদর করে 'নাককাটা বঙ্কবেহারি' বলেই তাঁরে ডাক্‌তো, শেষে উকিলবাড়িতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারিবাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম; তাঁর দাদা সেলরদের দালালি কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন ভাইয়েই

কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকাগুলিও রকমারি বটে, সুতরাং নানা-প্রকার বদ্‌মায়েশ পাল্লায় থাকবে বড় বিচিত্র নয়—অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্কবেহারিবাবুরা সিমলের একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠলেন, হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে লোকের মেজাজ যেরূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠকরা বুঝতেই পারেন (বিশেষতঃ, আপনাদের মধ্যেও কোন্ না দুই-একজন বঙ্কবেহারিবাবুর অবস্থার লোক না হবেন) ক্রমে বঙ্কবেহারিবাবু ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির প্যায়দা ও মালী পর্যন্ত আইনবাজ হয়ে থাকে সুতরাং বঙ্কবেহারিবাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন তা পূর্বেই জানা গিয়েছিল—আইন আদালতের পরামর্শ, জাল-জালিয়াতির তালিম, ইকুটির খোঁচ ও কমন্‌লার প্যাঁচে—বঙ্কবেহারিবাবু দ্বিতীয় শুভংকর ছিলেন। ভদ্দর লোক মাত্রকেই তাঁর নামে ভয় পেতে হত, তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন, এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠকচাচাও তাঁর কাছে পরামর্শ নিতেন!

আমরা সন্ধ্যার পরে বঙ্কবেহারিবাবুর বাড়িতে পৌঁছলাম। আমাদের বুড়ো রাম ঘোড়াটির মধ্যে মধ্যে বাতশ্লেষ্মার জ্বর হয়, সুতরাং আমরা গাড়ি চড়ে যেতে পারি নাই; রাস্তা হতে একজন ঝাঁকা মুটে ডেকে তার ঝাঁকায় বসেই যাই; তাতে গাড়ির চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু ঝাঁকা মুটে অপেক্ষা পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় যাওয়ায় আরাম আছে—দুঃখের বিষয় এই যে, সেটি সব সময় ঘটে না! পাঠকরা অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় এক বার সোয়ার হন্, তা হলে জন্মে আর গাড়ি পাল্‌কি চড়তে ইচ্ছা হবে না; যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন—যেন ইস্প্রিং-ওয়ালা কৌচ!

আমরা বঙ্কবেহারিবাবুর বাড়িতে আরও অনেকগুলি ভদ্রলোককে দেখ্‌তে পেলাম, তাঁরাও 'সোনা করার' বুজরুকি দেখ্‌তে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলের পরস্পর আলাপ ও কথাবার্তা থামলে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেরও সেই ঘরে যাবার অনুমতি হল। সে ঘরটি বঙ্কবাবুর বৈঠকখানার লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা শুদ্ধ পায়েই ঢুকলেম; ঘরটি চার কোনা সমান, মধ্যে সন্ন্যাসী বাগ্‌ছাল বিছিয়ে বসেচেন, সামনে একটি তিরশূল পোঁতা হয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ

শিব সাম্‌নে শোভা পাচ্চেন, পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলি ও আগুনের মাল্‌সা—সন্ন্যাসীর পেছনে দুজন চেলা বসে গাঁজা খাচ্চে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামানদিস্তে পড়ে রয়েচে—তারাই সোনা তৈরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন, অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডায় এণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে হরিবোলে সাল্লেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বস্‌তে বল্লেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্মের জন্ম হয়, তাঁরাই ধন্য! এই কন্দকাটা! এই ব্রহ্মদত্তি! এই রক্তদন্তী কালী—এই শেতলা! ছেলেদের কথা দূরে থাকুক, বুড়ো মিন্সেদেরও ভয় পাইয়ে ছ্যায়! সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জাগজ্জা করে বসেছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দুসন্তান মাত্রকেই শেওরাতে হয়েছিল! হায়। কালের কী মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তুর সেই পাথরের উপর পা তুলতে শঙ্কিত হচ্চে না; রে বিশ্বাস! তোর অসাধ্য কর্ম নাই! যার দাস হয়ে একবার একজনকে প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য কি! কোন্ ধর্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বলতে পারে! সুতরাং পুর্বে যারা ঘোরনাদী বজ্রে, জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পুজে গ্যাচে, তারা যে নরকে যাবে; আর আমরা কি বুধবারে ঘণ্টাখানেকের জন্যে চক্ষু বুজে ঘাড় নেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি?

সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিদ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যারে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হল, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহংকার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্বুদ্ধির কর্ম?—ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক ক্রিশ্চান ও মুসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তারাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজকাল যেখানে যে ধর্মে রাজ-মুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতি দিন সংসারের যেমন পরিবর্তন হচ্চে, ধর্ম, সমাজ, রীতি ও নিয়মও এড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্মের শরীর নির্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটি অস্বীকার কল্লেন—ক্রমে ক্রিশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্মের অলংকার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না! যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়-জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাদ করে 'ঘোড়ার ডিম' ও 'আকাশকুসুমে'র দলে গণ্য হতেন না! সুতরাং এক দিন আমরা তাঁরে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাকলেও ডাকতে পারি!

সন্ন্যাসী আমাদের বস্‌তে বলে অন্য কথা তোল্‌বার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময় বঙ্কবেহারিবাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারি-বাবু মাতায় একটি জরির কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান, 'বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে' পেড়ে শান্তিপুরে ধুতি ও ডুরে উড়ুনি মাত্র ব্যবহার করেছিলেন, আর হাতে একটি লাল রঙের রুমাল ছিল, তাতে রিং সমেত গুটিকত চাবি ঝুলচে।

বঙ্কবেহারিবাবুর ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও শেকহ্যাণ্ড চুকলে পর তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দিতে বুজিয়ে বললেন যে, এই সকল ভদ্দর লোকেরা আপনার বুজরুকি ও ক্যারামত দেখ্‌তে এসেচেন; প্রার্থনা—অবকাশমত দুই একটা জাহির করেন—তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজী হলেন। ক্রমে বুজরুকির উপক্রমণিকা আরম্ভ হল, বঙ্কবেহারিবাবু প্রোগ্র্যাম স্থির করলেন, কিছুক্ষণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রথমে ঘটের উপর হতে একটি জবাফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো—ঘটের উপর থেকে জবাফুল বর্ষাকালের কড়কটো ব্যাঙের মত থপাস্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, সন্ন্যাসী তার দু-হাত তফাৎ বসে রয়েচেন—এ দেখ্‌লে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়, সুতরাং ঘরসুদ্ধ লোক খানিক

ক্ষণ অবাক্ হয়ে রইলেন—সন্ন্যাসীর গম্ভীরতা ও দর্পভরা মুখ্খানি ততই অহংকারে ফুলে উঠ্তে লাগ্লো! এমন সময় একজন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত করলে—মদ দুদ হয়ে যাবে; পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিস বলে যদি দর্শকদের সন্দেহ হয়, তার জন্যে সন্ন্যাসী একটি নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদায় মদটুকু ঢেলে ফেললেন, ঘর মদের গন্ধে ভর হয়ে গেল—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হল এ মদ বটে!

সন্ন্যাসী নতুন সরায় মদ ঢেলে একটি হুংকার ছাড়লেন, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁতকে উঠ্লো, বুড়োদের বুক গুর্ গুর্ কত্তে লাগলো; ক্রমে একজন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'গুরু! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?' সন্ন্যাসী 'দুধ হো ব্যেটা!' বলে তাতে এক কুশি জল ফেলামাত্র সরার মদ দুধের মত সাদা হয়ে গেল। আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম—এইরকম নানা-প্রকার বুজরুকি ও কার্দানির প্রকাশ হতে রাত্তির এগারটা বেজে গেল, সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্কবাবুর প্রস্তাবে রাত্রের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হল; আমরা রাম রকমের একটি প্রণাম দিয়ে, একটি উল্লুক হয়ে বাড়িতে এলেম—একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকামুটেটি যে রাতকানা তা পূর্বে বলে নাই, সুতরাং তার হাত ধরে গুটি গুটি করে উজোন আদ ক্রোশ পথ ঠেলে তাকে কাঠের দোকানে পৌঁচে রেখে তবে বাড়ি যাই, দুঃখের বিষয় আবার সে রাত্রে বেড়ালে আমাদের খাবারগুলি সব খেয়ে গিয়েছিল, দোকানগুলিও বন্ধ হয়ে গ্যাচে, সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হতভম্ব হয়ে সে রাত্তির অতিবাহিত করি।

আমরা পূর্বেই বলে এসেচি 'দশ দিন চোরের এক দিন সেধের' ক্রমে অনেকেই বঙ্কবাবুর বাড়ির সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কত্তে লাগলেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরি ধত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্কবাবুর বাড়িতে গেলেম; পূর্বদিনের মত জবাফুল তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো, এমন সময় একজন মেডিকেল কালেজের বাংলা ক্লাসের বাঙাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেললেন, শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগানো ছিল!

সংসারের গতিই এই, এক বার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে, বালুঞ্চি বাঁধা জবাফুল ধরা পড়তেই সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তোবড়া তুবড়ির খানাতল্লাশি কত্তে লাগলেন; একজন ঘুরতে ঘুরতে ঘরের

কোণ থেকে একটা মড়া পাঁটা বার করলেন। সন্ন্যাসী একদিন ছাগল কেটে প্রাণদান স্থান; সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না পেরে ঘরের কোণেই (ফ্লোরওয়ালা মেঝে নয়) পুঁতে রেখেছিলেন, তাড়াতাড়ি বেমালুম করে মাটি চাপাতে পারেন নাই, পাঁটার একটি শিং বেরিয়েছিল—সুতরাং একজনের পায়ে ঠ্যাকাতেই অনুসন্ধানে বেরুলো। সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুধ করেছিল, সে দিন তারও জাঁক ভেঙে গেল, সেই মজলিসের একজন সাব আসিস্ট্যাণ্ট সার্জন বললেন যে আমিরিকান রম (মার্কিন আনীস) নামক মদে জল দেবা মাত্র সাদা দুধের মত হয়ে যায়। এই রকম ধরপাকড়ের পর বঙ্কবিহারিবাবুও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করেন; আমরা রৈ রৈ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম; হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি কেড়ে নিলেন, সেটি বিক্রি করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেই দিন থেকে এই রকম বুজরুক সন্ন্যাসীদের ওপর অশ্রদ্ধা হয়।

পুর্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যে রকম প্রাদুর্ভাব ছিল এখন তার অংশে আর গুণও নাই, আমরা শহরে ক-দিন কটা ঊর্ধ্ববাহু কটা অবধূত দেখতে পাই? ক্রমে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচুরিও লাঘব হয়ে আসচে, ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না, সুতরাং উৎসাহদাতা বিরহেই এই সকল ধর্মানুষঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে, কিন্তু কল্‌কেতা শহরের এমনি প্রসবক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্চেন যে, তাঁরা যাতে এই সকল বদমায়েশি চিরদিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্মের ভড়ং ও ভণ্ডামোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে, সহস্র সৎকার্য পায়ের নীচে ফ্যালে তার জন্যেই শশব্যস্ত। একজনরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল, এক দিন বড় ভাই তার মাকে বলে, যে, 'মা! তোমার গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলাগারদ।' সেই রকম একদিন আমরাও কল্‌কেতা শহরকে 'রত্নগর্ভা' বলেও ডাকতে পারি—কল্‌কেতার কি বড়মানুষ কি মধ্যাবস্থ এক একজন এক একটি রত্ন! এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচনকে মজলিসে হাজির করলেম।

বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার

বাবু পদ্মলোচন ওরুফে হঠাৎ অবতার ১১১২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়া-মুষুলীর মিত্তিরদের বাড়ি জন্মগ্রহণ করেন। নাউপাড়ামুষুলী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে; গাঁয়ের জমিদার মজফ্‌ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গোরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্মে বিরত ছিলেন, মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখতেন—মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামাক্কির গুণা কত্তেন না, ফারসীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাংলা ও উর্দুতেও তাঁর দখল ছিল; মজফ্‌ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাটির হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের উপরই দেওয়া হয়। পূর্বে মিত্তির বাবুদের বড় জলজলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ায় ভাগা-ভাগি ও বহু গুষ্টি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিল কিন্তু নিঃস্বত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকদের কাছে মানের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায়নি, সে দিন—হঠাৎ মেঘাড়ম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড়-ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্তির বসে ফোঁস ফোঁস করে, আর বাড়ির একটি পোষা টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে, পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুশি হয়ে আপনার পরবার একখানি লালপেড়ে শাড়ি দাইকে বকশিশ দ্যান, অভ্যাগত ঢুলী ও বাজন্দরেরাও একটি সিকি আর এক হাঁড়ি নারকেল নাড়ু পেয়েছিল। ক্রমে মহা আনন্দে আটকৌড়ে সারা হল, গাঁয়ের ছেলেরা 'আটকৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভালো; ছেলের বাবার দাড়িতে বসে হাগো' বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চক্‌চকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হল। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গোরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড়ঘরের দরজায় রেখে দোরষষ্ঠী' বলে হলুদ ও দুর্বো দিয়ে পুজো করা হল। ক্রমে পনেরো দিন বিশ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দতলায় ষষ্ঠীর পুজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়তে লাগলেন। গুলিডাণ্ডা, কপাটি কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছ্‌লে গেলি প্রভৃতি খেলায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়লেন। পাঁচ বছরে হাতে খড়ি হল, গুরুমহাশয়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুরপাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন, পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশীলে রোগেরও অভাব রইলো না; ক্রমে কিছু দিন এই রকমে যায়, একদিন পদ্মলোচনের বাপ মরলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গেলেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে সল্লেন সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষশূন্য প্রায় হল; জমিজমাগুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে কতক গিয়ে ফেললে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গেল, সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের উপর নির্ভর কত্তে হল। পদ্মলোচন কল্‌কেতায় এসে এক বাসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাই ফরমাস, কাপড় কোঁচানো ও লুচি ভাজা প্রভৃতি কর্মে ভর্তি হলেন,—অবকাশমত হাতটাও পাকানো হবে—বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখাপড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন!

পদ্মলোচন কিছুকাল ঐ নিয়মে বাসাড়েদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগলেন; ক্রমে দু-এক বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালো মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ করলেন। শহরে যে বড় মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্বত্রই লোকারণ্য দেখ্‌তে পাবেন, যদি ভিতরকার খবর জান তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠ্‌নোওয়ালা, দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলেই বিস্তর দেখ্‌তে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটি বাড়লেন; ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও হাজ্‌রের পর দু-চারখানা সই সুপারিশও হস্তগত হল; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন-সরকারী কর্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্টভোগের একশেষ করেছিলেন, ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও কাপড় কোঁচানো, লুচি ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়েছিল; ক্রমশ লুচি ভাজতে ভাজতে ক্রমে লুচিভাজায় তিনি এমনি তৈরি হয়ে উঠলেন যে তাঁর মত লুচি অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজতে পাত্তো না। বাসাড়েরা খুশি হয়ে তাঁরে 'মেকর' খেতাব ন্যায়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষা কথায় বলে 'যখন যার কপাল ধরে মুতে বসে——' যখন পড়্তা পড়তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধরলে সোনামুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্‌তে আরম্ভ হল—মুচ্ছুদ্দী অনুগ্রহ করে সিপসরকারী কর্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকি ও কাজের হুঁশিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন—একমনে সেবা করলে ভয়ংকর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে, তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতাগুলোকেও প্রসন্ন করেচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভালো করবার চেষ্টায় রইলেন; এক দিন হউসের সদরমেট কর্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্মে ভর্তি করলেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেননি, কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভালো দ্যাখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাকৃতে হল না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির ফোসকার মত ফুলে উঠলো—বের জল পেলে কনেরা যেমন ফেঁপে ওঠে, তিনিও তেমন ফাঁপতে লাগলেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদী কর্ম ছেড়ে·· দিলেন, সাহেবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদী হলেন।

টাকায় সকলই করে! পদ্মলোচন মুচ্ছুদী হবামাত্র অবস্থার পরিবর্তন বুজতে পারলেন, তার পরদিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগলো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গেল, কেউ পদ্মলোচনবাবুকে নমস্কার করে হাঁটু গেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ 'আপনার সোনার দোত কলম হোক' 'লক্ষপতি হোন' 'সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক' 'অনুগতের

হুজুর ভিন্ন গতি নাই' প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুঁহুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগলেন—ক্রমে দুরবস্থা দুকুরে লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে লুকুলেন—অভিমান ও অহংকারে ভূষিতা হয়ে সৌভাগ্যযুবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন করলেন; হুজুকদারেরা আজকাল 'পদ্মলোচনকে পায় কে' বলে ঢ্যাড়্রা পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি—রেও বামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সেজে এই কথাটি সর্বত্র ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন—শহরে ঢিঢি হয়ে গেল—পদ্মলোচন একজন মস্ত লোক! কল্‌কেতা শহরে কতকগুলি বেকার 'জয়কেতু' আছেন, যখন যার নতুন বোলবালাও হয় তখন তারা সেইখানে মেশেন, তাকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখেন ও অনন্যমনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন; আমরা ছেলেবেলা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে 'ছাঁদন দড়ি ও গোদা বাড়ির' গল্প শুনেছিলাম, এই মহাপুরুষরা ঠিক্ সেই ছাঁদন দড়ি ও গোদা বাড়ি!' গল্পে আছে, রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা করলে, 'ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি এখন তুমি কার?'—'না আমি যখন যার তখন তার!' তেমনি হুতোম প্যাঁচা বলেন শহরে জয়কেতুরাও 'যখন যার তখন তার' !!!
জয়কেতুরা ভদ্রলোকের ছেলে, অনেকে লেখাপড়াও জানেন, তবে কেউ কেউ মূর্তিমতী মা! এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন, বেকার পেনস্থনে ও ব্রোকদই বিস্তর। বহু কালের পর পদ্মলোচনবাবু

কল্‌কেতা শহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ বৎসর হল শহরের 'হঠাৎ বাবুর' উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন 'জয়কেতু' 'মোসাহেব' 'ওস্তাদজী' 'ভড়ঙ্গা'

'ঘোষজা' 'বোসজা' প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের 'তর্পণের কোষায়' জুড়াবার জায়গা পেলেন!

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুললেন, পড়্তাও ভালো চললো—পদ্মলোচন অ্যামবিশনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনাদার বাবুদের মত গাঢাকা হলেন—পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোশ পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পদধুলো খান—পা চাটেন—দলাদলির ও হিন্দুধর্মের ঘোঁট করেন—ঠাকরুণ বিষয় ও সখীসংবাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিংপেপার; পদ্মলোচনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ! বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনির সময় গবর্নমেণ্ট যেমন দোচোকোব্রত ভলন্‌টিয়ার জুটিয়েছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখলেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত বিবিধ আশ্চর্য জীব একত্র করলেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত!!!

বাঙালী বদমায়েশ ও দুর্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়েশি ও টাকা একত্র হলে হাতী পর্যন্ত মারা পড়ে, সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্টো বাঁড়ুজ্যে পর্যন্ত যাতে মারা যান! পদ্মলোচনও পাঁচজন কুলোকের পরামর্শে বদমায়েশি আরম্ভ করলেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিটকারি করা তাঁর কাজ হল, ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোড়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগ্‌লেন; পারিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কত্তে লাগলো, বাজে লোকে 'হঠাৎ অবতার' খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্দরলোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক্ হয়ে ক্ল্যাপ্ দিতে লাগলেন!

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরে ছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ইহুদীদের ভাবী মেসায়া—তারই সফলতা ও সার্থকতার জন্যে পদ্মলোচন বুজরুকি পর্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই।

বিলাতী জুজেস্ ক্রাইস্ট—এক টুক্‌রো রুটিতে একশ লোক খাইয়েছিলেন—কানা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভালো কত্তেন। হিন্দুমতের কেষ্টও পুতনা বধ, শকট ভজন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য করেছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্যে শহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, 'তিনি এক দিন বারো জনের খাবার জিনিসে একশ লোক খাইয়ে দিলেন'; কানা খোঁড়ারা সর্বদাই

হাত্তা বেড়ির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত পদ্মহস্ত পাবার প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন বুড়ি বুড়ি মাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে 'হাতবুলানো' পাইয়ে আনে—প্রভৃতি নানাবিধ বুজরুকি প্রকাশ কত্তে লাগলেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মড়কের শকুনির মত নাচতে লাগলেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন—অন্যের কি কথা। ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোল্‌তা আর ভোঁভূয়ে ভোমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেথায় পদার্থহীন উই পোকারা—আন্‌সাড়ে আরস্থলোয় দল, আর দু-একটা গোডিমওয়ালা ফচ্‌কে নেংটি ইঁদুর মাত্র!

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না; 'হঠাৎ অবতার' হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্তি হয় নাই—বাদশাই পেলেই যে সে আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি! কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুললে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচ্‌লে জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে! ওরে! ওরে! হুজুর ও 'যো হুকুমের' হল্লা পড়ে গেল, ক্রমে শহরের বড় দলে খপর হল যে কলকেতার ন্যাচ্‌র্যাল হিষ্ট্রির দলে একটি নম্বরে বাড়লো!
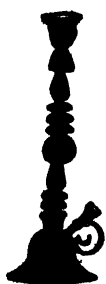
ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগলেন, অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিন্‌লেন, শহরে বড়মানুষ হলে যে সকল জিনিসপত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশ সেই সকল জিনিস সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পুরে ফেললেন, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখলেন।

বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ শহরে বাহাদুরির কাজ ও বড়মানুষের এলবাত পোশাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানুষ বহু কাল হল মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয়নি, যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কল্‌কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজ্‌ড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আম্‌লা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দীরা যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম

দেখেন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইনমত অর্শায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন।—এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান্ স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, তোপ পড়ে গেলে ফর্সা হবার পূর্বে গাড়ি বা পালকি করে বিবি সাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন—স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রাণ পান। ছোক্‌রাগোছের কোন কোন বাবুরা বাপ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে একজন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসীপাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্য রাত্তির কেটে গেলে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছেলেবেলা থেকে 'ধর্ম যে কার নাম তা শোনেনি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক, কতকগুলি হতভাগ্য মোসাহেবই যাদের হাল্' তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাকবে, এ বড় আশ্চর্য নয়! কল্‌কেতা শহর এই মহাপুরুষদের জন্যে বেশ্যাশহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কম্‌চে না। এমন কি একজন বড়মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস করবার যো নাই; তা হলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলী দেবে—যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না করবে তত দিন দেখ্‌তে পাবেন বাবু অষ্ট প্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারান্দাতেই আছেন, কখনো হাসচেন, কখনো টাকার তোড়া নিয়ে ইশারা করে দ্যাখাচ্চেন এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আনতে পারবেন তত দিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাক্‌তে হবে, হয়তো সেকালের নবাবদের মত 'জান বাচ্চা এক গাড়' হবার হুকুম হয়েচে! ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কসব করাই তার অনন্যগতি হয়ে পড়ে! শুধু এই নয়; শহরের বড়মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়েমানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নি ভাগ্নি—বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই

তাঁর ভোগে লাগে—এতে কত সতী আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেশ জানি, অনেক বড়মানুষের বাড়ি মাসে একটি করে ভ্রূণহত্যা হয় ও রক্তকম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের মুন তেলের মত উঠনো বরাদ্দ আছে! যেখানে হিন্দুধর্মের অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট, ও ভদ্রলোকের অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভেতরবাগে উদোম এলো কিন্তু বাইরে পাদে গেরো!

হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি, সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্যে কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে! আজ একশ বৎসর অতীত হল, ইংরেজরা এদেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েচে? সেই নবাবী আমলের বড়মানুষী কেতা, সেই পাকানো কাছা, সেই কোঁচানো চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরি চুল আজও ছ্যাখা যাচ্চে বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্তন ছ্যাখা যায়, কিন্তু আমাদের হুজুরেরা যেমন তেমনই রয়েচেন! আমাদের ভরসা ছিল কেউ হঠাৎ বড়মানুষ হলে রিফাইণ্ড গোছের বড়মানুষীর নজীর হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নির্মূল হয়ে গেল—পদ্মলোচন আবার কফিন চোরের ব্যাটা ম্যাকৃমারা হয়ে পড়লেন; কফিন চোর, মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি কত্তো মাত্র কিন্তু তার উত্তরাধিকারী মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি করে শেষে—রাঁড় রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ কল্লেন, স্ত্রী চরে খেতে লাগলেন, পূর্ব সহবাস বা তাঁর হাতযশে পদ্মলোচনের গুটি চারেক ছেলে হয়েছিল; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠলো সুতরাং তাঁর বিবাহে বিলক্ষণ ধুমধাম হবার পরামর্শ হতে লাগলো! ক্রমে বড় বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগলো, ঘটক ও ঘটকীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন—'কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তোর থাকৃবে' এমনটি শিগগির জুটে ওটা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা গোছা ও ছ্যাখা শোনার পর শহরের আগড়োম ভোঁম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুটলো! আত্মারামবাবু খাস হিঁদু, কাপ্তেনির কর্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারামবাবুর সংসারও রাবণের সংসার বললে হয়—

সাত সাতটি রোজগেরে ব্যাটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চাল্লিশ পৌত্তুর পৌত্তুরী, এ সওয়ায় ভাগ্নে জামাই কুটুম্বু সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজগিজ করে —সুতরাং সর্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হল, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্যাদা মত পত্রের বিদেয় পেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে দিতে চলল; বিয়ের ভারী ধুম! শহরে হুজুক উঠলো পদ্মলোচনবাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে কিন্তু এত নয়!

দিন আস্‌চে; দেখতে দেখতেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এল—ক্রিয়েবাড়িতে নহবত বসে গেল। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য ও দলস্থদের ঘোঁট বাদানো শুরু হল—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোনার লোহা, ও ঢাকাই শাড়ি দু-লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত দলে বিতরণ হল, বড়মানুষদের বাড়িতেও শাল ও সোনাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গ্যাঁদ্‌ড়া কন্দক্, গোলাব ও আতর, ও এক এক জোড়া শাল সওগাত পাঠানো হল; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজন্দরে নই যে শাল নেবো! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না। পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠ্‌লেন—ব্যাটার অদৃষ্টে নাই!

এদিকে বিয়ের বাইনাচ আরম্ভ হল, কোথাও রূপোর বালা, লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দীপরা চাকরেরা ঘুরে ব্যাড়াচ্চে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের

বাজনা আন্‌বার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তৈয়ির জন্যে দর্জীরা একমনে কাজ কচ্চে—চার দিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ—বাবুর দেওয়া শালে শহরের রাস্তার অর্ধেক লোকই লালে লাল হয়ে গেল, ঢুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরনো শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লোকেও শাল পেয়ে লাল হয়ে গেলেন!

১২ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিল, আজ ১২ই পৌষ; আজ বিবাহ। আমরা পূর্বেই বলেচি যে শহরে ঢি ঢি হয়ে গিয়েছিল যে 'পদ্মলোচনের

ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ' সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগ্‌লো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি-ঘোড়া চলবার পথ করে দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড়, পাঙ্খা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু-পাশে চললো, ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চল্‌তি নবৎ ছিল, তার পেছনে গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপর হর পার্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়াপঙ্খী, হাতীপঙ্খী, উটপঙ্খী ও ময়ূরপঙ্খী; পঙ্খীগুলির উপরে বারোজন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওদাগর সাজা, ও দুটি করে ঢোল। তার আশে পাশে তক্তানামার ওপর 'মগের নাচ' 'ফিরিঙ্গীর নাচ' প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং। তার পশ্চাৎ একশ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি ষাইটেক ঢাক মায় রোশনচৌকি—শানাই, ভোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাসা রকমের চুনোগলির ইংরেজি বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই এক রকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ানো, হাতে এক গাছি ইষ্টিক; হটাৎ বোধ হল যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড্‌-সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাস গেলাশ, ও রূপোর ডাণ্ডিতে রেশমের নিশেন-ধরা তকমা-পরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্টচাযি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা; এর পেছনে রাঙামুখো ইংরেজি বাজনা, সাজা সায়েব তুরুকসওয়ার, বরের ইয়ারবক্স, খাস দরওয়ানরা, হেড খানসামা ও রূপোর সুখাসনে বর; সুখাসনখানির চার দিকে মায় বাতি বেললণ্ঠন টাঙানো, সামনে রূপোর দশ-ডেলে বসা ঝাড়, দুই পাশে চামরধরা

ছুটো ছোঁড়া: শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাটরা, বাড়ির পরামানিক, সোনার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকলগুলির উপরে এক এক চাকর, ডবল বাতি দেওয়া হাতলণ্ঠন ধরে বসে যাচ্চে।

ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল, ও নাগরার শব্দে, লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চিৎকারে কল্‌কেতা কাঁপতে লাগ্‌লো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাক্‌বে, রাস্তার দু-ধারি বাড়ির জানলা ও বারান্দা লোকে পুরে গেল, বেশ্যারা 'আহা দিব্যি ছেলেটি যেন চাঁদ!' বলে প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লো, হুতোম প্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্‌শা নিতে লাগ্‌লেন—ক্রমে বর কনেবাড়ি পৌঁছল। কন্যাকর্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরযাত্তোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতী বুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্যে বরকত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর সভায় গিয়ে বস্‌লেন, ভাটেরা ছড়া পড়তে লাগ্‌লো, মেয়েরা বারান্দা থেকে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো, ঘটকরা মিত্তিরবাবু ও দত্তবাবুর কুলজী আউড়ে দিলে; মিত্তিরবাবু কুলীন সুতরাং বল্লালী রেজেস্টরীতে তাঁর বংশাবলী রেজেস্টারী হয়ে আছে, কেবল দত্তবাবুর বংশাবলীটি বানিয়ে নিয়ে হয়!

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্যে বাড়ির ভিতর গেলেন। ছাঁদনাতলায় চারটি কলাগাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পিঁড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাঁড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে মায় শাশুড়ী এয়োরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বললেন 'হাতে দিলেম মাকু একবার ভ্যাঁ কর তো বাপু'! বর কলেজ বয়, আড়-চোকে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লঙ্কা ভাগ কচ্ছিলেন: সুতরাং 'মনে মনে কল্লেম' বললেন—অমনি শালাজরা কান মলে দিলে, শালীরা গালে ঠোনা মাল্লে, শেষে গুড় চাল, তুক্‌তাক্‌ ও ওষুদ বিষুদ ফুরুলে উচ্ছুগ্‌গু করবার জন্যে কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হল, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্‌গু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে

বাসরে নে যাওয়া হল। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়। আমরা তো এত বুড়ো হয়েচি, তবু এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়লে মুখ দে লাল পড়ে পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়!

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অস্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান হয়েও যেন তাঁর মানভঞ্জনের জন্যেই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হাসতে লাগ্‌লেন, পাখিরা 'ছি ছি কামোন্মত্তদের কিছু মাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে না' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, বায়ু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লাগলেন—দেখে ক্রোধে সূর্যদেব নিজ মূর্তি ধারণ কল্লেন ; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদূরান্তরে পালিয়ে গেল—বিয়েবাড়িতে বাসী বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগলো। হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ানো হল, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুকতাকের পর, বর-কনের গাঁটছড়া কিছুক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়। এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুটতে লাগ্‌লেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হল, বরের মা বর-কনেকে বরণ করে ঘরে তুল্লেন, এক কড়া দুদ দরজার কাছে আগুনের উপর বসানো ছিল, কনেকে সেই দুদের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল, 'মা! কি দেখ্‌চো? বলো যে আমার সংসার উত্‌লে পড়্‌চে দেখছি'—কনেও মনে মনে তাই বললেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নীতে নানা রকম তুকতাক্ কল্লে পর বর-কনে জিরুতে পেলেন, বিয়েবাড়ির কথঞ্চিত গোল চুক্‌লো—ঢুলীরা ধেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, অধ্যক্ষরা প্রলয় হিন্দু সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও এক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায়

আড় হলেন, বর-কনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নাই, যে বাড়ির বড়গিন্নীর মতে আজকের রাত—কালরাত্তির।

শীতকালের রাত্তির শিগ্‌গির যায় না। এক ঘুম, দু-ঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ এক ঘুম হয়, ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গেল—প্রাতঃস্নানে মেয়েগুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে,—বুড়ো বুড়ো ভট্টচায্যিরা স্নান করে, 'মহিম্নঃ পারন্তে' মহিম্নস্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এদিকে পদ্মলোচন রাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আটটার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল—শহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁড় আছে একথা আমরা পূর্বেই বলেচি, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে সকালবেলা প্রাতঃস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন—যেন রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরেছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এসে জমলেন—মোসাহেবরা 'হুজুর! কল্‌কেতায় এমন বিয়ে হয়নি হবে না' বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে লাগ্‌লেন। ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এল, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ির চাকর-চাকরানীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও একখানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও রেশালার লোকেরা বক্‌শিশ পেয়ে বিদেয় হল; মহাসমারোহে পাঁচ লক্ষ টাকার বিবাহ শেষ হয়ে গেল; কোন কোন বাড়ির গিন্নীরা সামগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয় টাঙিয়ে রাখলেন, অধিক অংশ পচে গেল, কতক বেড়ালে ও ইঁদুরে খেয়ে গেল তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড়মানুষদের বাড়ির গিন্নীরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয়। শেষে পচে গেলে মহারানীর খানায় ফেলে দেওয়া হবে সেও ভালো। কোন কোন বাবুরও এ স্বভাবটি আছে—শহরের এক বড়মানুষের বাড়িতে পুজার সময় নবমীর দিন গুটি ষাইটেক্ পাঁটা বলিদান

হয়ে থাকে; পুর্বপরম্পরায় সেগুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আস্‌ছে, কিন্তু আজকাল সেই পাঁটাগুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পুজোর গোল চুকে গেলে পুর্ণিমার পর সেইগুলি বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে, সুতরাং ছয়-সাত দিনের মরা-পচা পাঁঠা কেমন উপাদেয়, তা পাঠক! আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বার কত্তে হয়। আমরা যে পুর্বে আপনাদের কাচে শহরের সর্দার মুর্খের গল্প করেচি, ইনিই তিনি!

এদিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গেল, পদ্মলোচন বিষয় কর্ম কত্তে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে তের পার্বণ ফাঁক দিতেন না; ঘেঁটুপুজোতেও চিনির নৈবিদ্দি ও শকের যাত্রা বরাদ্দ ছিল ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পুজো আচ্চা কত্তেন, রক্ষিত মেয়েমানুষ ও অনুগত দশ-বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো তেমনি ধুমে পুজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশজন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ দিয়ে ছ্যান। ইংরেজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্যে এক দিনও উদ্যত হননি— শুভ কর্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর-পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছুমাত্র সাহায্য করেননি, বরং দেশের ভালো করবার জন্যে কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে ক্রিশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন—একশো বেলেল্লা বামুন ও দুইশো মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হত—তাতেই পদ্মলোচন বংশ মহান্ পবিত্র বলে শহরে বিখ্যাত হয়। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, সুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশ-পরম্পরার স্থির সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ঐ বংশের ভদ্রলোক-দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না! উনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের জন্যে শহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক্ যত্নবান হন, তারো সম্ভাবনা নাই। তিনি যেমন হিন্দুধর্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবা-বিবাহের নাম শুন্‌লে তিনি কানে হাত দিতেন—

ইংরেজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে ক্রিশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরেজি পড়াননি—অথচ বিদ্দেসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানোও হয়ে ওঠে নাই—বিশেষতঃ শূদ্রের সংস্কৃতে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও 'বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া'র দলেই পড়ে।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে আশি বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর দশ দিন পুর্বে একদিন হঠাৎ অবতারের সর্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লে—তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসায় ভারী দ্বেষ কত্তেন, বিশেষতঃ তাঁর ছেলেবেলা পর্যন্ত সংস্কার ছিল ডাক্তারি ওষুধ মাত্রেই মদ মেশানো, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করানো হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, শেষে আত্মীয়রা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রী৶ভাগীরথীতটস্থ কল্লেন; সেখানে তিন রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পাঠকগণ! আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহু দূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন, তাঁর সুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন এমন নয়, শহরের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড়লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক! যাঁদের হতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলই নিরর্থক হবে!

আলালের ঘরের দুলাল লেখক—বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন 'শহরের মাতাল বহুরূপী' কিন্তু আমরা বলি, শহরের বড়মানুষরা নানারূপী—এক এক বাবু এক এক তরো, আমরা চড়কের নক্‌শায় সেগুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেচি, এখন

ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচু দল খাস হিন্দু; এই হঠাৎ অবতারের নক্শাতেই আপনারা সেই উঁচুকেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র জানতে পারলেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফর্মেশনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গসুখ-সৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট!
হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়ে নিয়েছি; আমরা ক্রমে আরো ঘনিষ্ঠ হব, ততই রং ও নক্শার মাজে মাজে সং সেজে আস্‌বো—আপনারা যত পারেন হাততালি দেবেন ও হাসবেন!

মাহেশের স্নানযাত্রা

গুরুদাস গুঁই সেরুভ কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি। তিরিশ টাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজগারও আছে—গুরুদাসের চাঁপাতলা অঞ্চলে একটি খোলার বাড়ি ছিল; পরিবারের মধ্যে এক বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসী মাত্র।
গুরুদাস বড় সাখরচে লোক, যা দশ টাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায়; এমন কি কখনো কখনো মাস কাবারের পূর্বে গয়নাখানা ও জিনিসটে পত্তরটাও বাঁদা পড়ে; বিশেষতঃ শ্রাবণ মাসে ইলিশ মাছ ওঠবার পূর্বে ঢ্যালা ফ্যালা পার্বণে গুরুদাসের দু-মাসের মাইনেই খরচ হয়—ভাদ্দর মাসের আরন্দটি বড় ধুমে গ্যাচে, আর পিঠেপার্বণেও দশ টাকা খরচ হয়েছিল—ক্রমে স্নানযাত্রা এসে পড়লো। স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে; সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নাবা খাওয়ারও অবকাশ রইল না; ক্রমে আরো পাঁচ ইয়ার জুটে গেল। স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তদ্‌বির ও পরামর্শ হতে লাগ্‌লো; কেবল দুঃখের বিষয়—চাঁপাতলার হলধর বাগ, মতিলাল বিশ্বেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম্ ফ্রেণ্ড ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন হল হলধর একটা চুরি মাম্‌লায় গেরেপ্তার হয়ে দু-বছরের জন্যে জেলে গ্যাচেন, মতি বিশ্বেস মদ খেয়ে পাত্‌কোর ভেতর পড়ে গিয়েছিল, তাতেই তাঁর দুটি পা ভেঙে গিয়েচে, আর হারাধন গোটা কতক টাকা বাজার-দেনার জন্যে ফরেশডাঙায় সরে গ্যাচেন;

সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নানযাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগ্‌চে, কিন্তু তা হলে কি হয়—সম্বৎসরের আমোদটি বন্ধ করা কোন ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গমিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কত্তে হয়! এদিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিসের আয়োজন হতে লাগ্‌লো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে একখানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ ফুলুরি ও বেগুন ভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবি খিলির দোনা, মোমবাতি ও মিটে কড়া তামাক ও আর আর জিনিসপত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখলেন। কাল রাত্তিরের জোয়ারে নৌকোয় ওঠা হবে স্থির হল।

পূর্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচখেলা হত, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যাম্‌টা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতোর, কাঁসারি, কামার ও গন্ধবেনে মশাইরাই যা রেখেচেন, মধ্যে মধ্যে দু-চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোক্‌রা গোছের নূতন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।

ক্রমে সে দিনটি দেখতে দেখতে এসে গেল। ভোর না হতে হতেই গুরুদাসের ইয়াররা সেজে গুজে তৈরি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। গোপাল এক জোড়া লাল রঙের এস্টকিং (মোজা) পায়ে দিয়েছিলেন, পেতলের বড় বড় বোদাম দেওয়া সবুজ রঙের একটি ফতুই ও গুল্‌দার ঢাকাই উড়ুনি তাঁর গায়ে ছিল আর একটি বিলিতি পেতলের শিল আংটিও আঙুলে পরেছিলেন কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিনতে পারেন নাই বলেই শুদ্ধু পায়ে আসা হয়। নবীনের ফুলদাব ঢাকাই চাঁদরখানি বহুকাল ধোপাব বাড়ি যায়নি, তাতেই যা একটু ময়লা ময়লা বোধ হচ্ছিল, নতুবা তাঁর চার আঙুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙা হয়েছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম হয়েচে, বয়সও অল্প, সুতরাং আজো ভালো কাপড় চোপড় করে উঠ্‌তে পারেননি, কেবল গত বৎসর পুজোর সময় তাঁর আই ন-সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে দ্যায়, তাই পরে এসেছিলেন, সেগুলি আজো কোরা থাকায় তাঁরে দেখতে বড় মন্দ দেখায়নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বললেই হয়—বল্‌তে কি,

তিনি তো বেশী দিন পরেননি, কেবল পুজোর সময় সপ্তমী পুজোর একদিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখতে গিয়েছিলেন—ভাসান দেখতে যাবার সময় একবার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারি পুজো হয়, তাতেই একবার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুনতে গেছ্‌লেন—তা ছাড়া অমনি সিকের উপর হাঁড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আসবামাত্র গুরুদাস বিছেনা থেকে উঠে দাওয়ায় বসলেন। নবীন, গোপাল ও ব্রজও খুঁটি ঠ্যাসান দিয়ে উপু হয়ে বসলেন। গুরুদাসের মা চকমকি, শোলা, টিকে ও তামাকের মেটে বাক্সটি বার করে দিলেন। নবীন চকমকি ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজলেন। ব্রজ পাত্‌কোতলা থেকে হুঁকোটিকে ফিরিয়ে এনে দিলেন; সকলেরই এক একবার তামাক খাওয়া হল। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত মুখ ধুতে গেলেন; এমন সময়ে ঝম্‌ ঝম্‌ করে এক পশলা বৃষ্টি এল, উঠোনের ব্যাঙগুলো থপ্‌ থপ্‌ করে নাপাতে নাপাতে দাওয়ায় উঠতে লাগ্‌লো; কিন্তু নবীন, গোপাল ও ব্রজ তারি তামাসা দেখতে লাগ্‌লেন! নবীন একটি সখের গাওনা জুড়ে দিলেন:

'শখের বেদেনী বলে কে ডাক্‌লে আমারে!'

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থার মত অস্থির। সর্বদাই হচ্চে যাচ্চে তার ঠিকানা নাই—ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল। গুরুদাসও হাত মুখ ধুয়ে এসেই মাকে খাবার দিতে বললেন; ঘরে এমন তৈরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তা ভাত আর তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি মেটে খোরায় বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।

পূর্বে স্থির হয়েছিল, রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নানযাত্রাটি যে রকম আমোদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন বেলা দুপুরের পর মাহেশ পৌছুতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হল। এদিকে গির্জের ঘড়িতে টুং টাং, টুং টাং করে দশটা বেজে গেল। নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে, পানতামাক খেয়ে, তোবড়া-তুবড়ি নিয়ে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা একখানি পাখা ও দুটি ধামা কিনে আন্‌তে বললেন, তাঁর স্ত্রী পূর্বের রাত্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ি ঘুন্‌সি ও গুরিয়া পুতুল আন্‌তে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসীর জন্যে একটি খাজা কোয়াওলা ভালো কাঁঠাল, কানাইবাঁশী কলা ও কুলী বেগুন আন্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

গুরুদাসের পোশাকটিও নিতান্ত মন্দ হয়নি, তিনি একখানি সরেস গুল্‌দার উড়ুনি গায় দিয়েছিলেন, উড়ুনিখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাটের কুচো বাঁদবার দরুন চার-পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছলো—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটার্নের পিরাণ ছিল, তার ওপর বুলু রঙের একটি হাপ চায়নাকোট—তিনি 'বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে' পেড়ে এক শান্তিপুরে ফরমেসে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বক্‌লস্ দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌছলেন। সেথায় কেদার, জগ, হরি ও নারাণ তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করেছিল; তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠ্‌লেন। মাঝিরা শুঁটকী মাছ, লঙ্কা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছিল। জোয়ারও আসে নাই; সুতরাং কিছুক্ষণ নৌকা খুলে দেওয়া বন্ধ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকোয় উঠেই আয়েস জুড়ে দিলেন। গোপাল সন্তর্পণে জবাবির চৌপলের শোলার ছিপিটি খুলে ফেললেন। ব্রজ এক ছিলিম গাঁজা
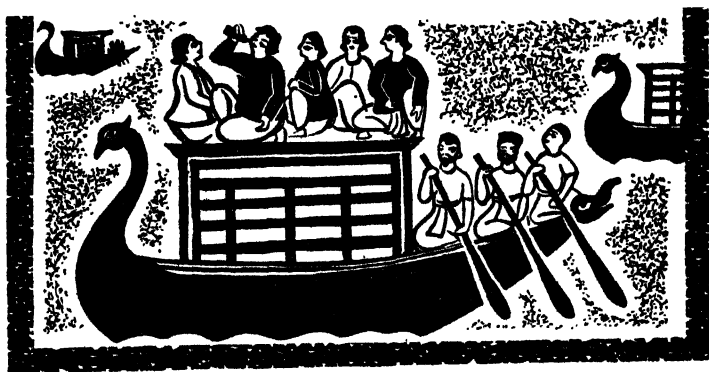
তৈরি কত্তে বস্‌লেন—আতুরী ও জবাবিরা চলতে শুরু হল। ফুলুরি ও বেগুনভাজীরা সেকালের সতী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহগমন কত্তে লাগলেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠ্‌লো—এদিকে নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

'হেসে খেলে নেও রে যাদু মনের সুখে।
কে কবে যাবে শিঙ্গে ফুঁকে।

তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,
তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে ত্যায় ট্যাঁকে।
তখন নুড়ো জ্বেলে দেবে ও চাঁদমুখে ॥'

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ গাঁজায় দম্ মেরে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখতে লাগলেন, গোপাল ও গুরুদাসের ফুর্তি ত্যাখে কে!

এদিকে শহরের স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গ্যাছে। বুড়ি বুড়ি মাগী, কলাবউয়ের মত আধ হাত ঘোম্‌টা দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁ করা ছুঁড়িরা রাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখতে চলেচে; এমন কি রাস্তায় গাড়ি পালকি চলা ভার, আজ শহরে কেরাঞ্চী গাড়ির

ঘোড়ায় কত ভার টানতে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাড়ির ভেতর ও পেছনে কত তাংড়াতে পারে, তারই তক্‌রার হচ্চে—এক একখানি গাড়ির ভেতর দশজন, ছাতে দুজন, পেছনে একজন ও কোচবাক্সে দুজন—একুনে পনেরজন, এ সওয়ায় তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও! গেরস্তর মেয়েরাও বড ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দরবউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে গ্যাচেন। জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন—অনেকেই কেষ্ট সাজবেন!

গঙ্গারও আজ চুড়ান্ত বাহার; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ্ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো, রং, হাসি ও ইয়ার্কির গর্‌রা উঠ্‌চে, কোনটিতে খ্যাম্‌টা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায়

ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন; মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত ও তেলের কুপোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলি ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোচ্চা গলায়—মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা পাতানো কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি কচ্চেন; বয়স ষাট পেরিয়েচে, অথচ 'রাম'কে 'আম' ও 'দাদা' ও 'কাকা'কে 'দাঁদাঁ' 'কাঁকাঁ' বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রংপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কব্‌লান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও বেলা চারটে অবধি পুজো করেন। অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্যোদয় দেখেচেন কি না সন্দেহ!

কোন পিনেসে এক দল শহুরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরেজি ইস্পিচে লিড্‌নি মরের শ্রাদ্ধ হচ্চে, গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্চে।

কোন পান্‌সিখানিতে একজন তিলকাঞ্চুনে নবশাখ বাবু মোসাহেব ও মেয়েমানুষের অভাবে পিসতুতো ভাই, ভাগ্নে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবি খিলি নাই, এমন কি একটা থেলো হুঁকোরও অপ্রতুল—তবু এমনি খোস্‌মেজাজ, এমনি শক যে, পানসির পাটাতনের তক্তা বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলেচেন, যেমন করে হোক কায় ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এদিকে আমাদের নায়ক গুরুদাসবাবুর বজরায় মাজিদের খাওয়া-দাওয়া হয়েচে; দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, এমন সময়ে গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দ্যাখ্‌ ভাই গুরুদাস! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে, কিন্তু একটার জন্যে বড় ফাঁক ফাঁক দ্যাখাচ্চে; সবই হয়েচে, কেবল মেয়েমানুষ না হলে তো স্নানযাত্রায় আমোদ হয় না! যা বল, যা কও,' —অমনি কেদার 'ঠিক বলেচ বাপ!' বলে কথার খি ধরে নিলেন; অমনি নারাণ বলে উঠলেন, 'বাবা, যে নৌকোখানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষ্‌ষি! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্চি।'

গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গ্যাচে, সুতরাং 'বাবা ঠিক বলেচ! আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম, ভাই! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই কব্‌লে একটা মেয়েমানুষ নে এসো আমি বাবা তাতে পেচ্‌পাও নই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ!' এই কথা বল্‌তে না বল্‌তেই নারাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে

উঠলেন ও মাজিদের নৌকো খুলতে মানা করে দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এদিকে গুরুদাস, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা চিৎকার করে—

যাবি যদি যমুনা পারে ও রঙ্গিণী।
কত দেখ্‌বি মজা রিষ্‌ড়ের ঘাটে শ্যামা বামা দোকানী।
কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুরে ঘুনসি খাসা,
উভয়ের পুরাবি আশা, ও সোনামণি॥

গান ধরেচেন, এমন সময় মেকিণ্টশ বরন্ কোম্পানির ইয়ার্ডের ছুতোরেরা এক বোট ভাড়া করে রাঁড় নিয়ে আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল; তারা গুরুদাসকে চিনতে পেরে তাদের নৌকো থেকে—

চুপে থাক্ থাক্ থাক্ রে ব্যাটা কানায়ে ভাগ্নে।
গোরু চরাস্ লাঙ্গল ধরিস্, এতে তোর এত মনে॥

গাইতে গাইতে হুর্‌রে ও হরিবোল দিয়ে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গেল; গুরুদাসেরাও হুউও ও হাততালি দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়েমানুষ না থাকাতে সেটি কেমন ফাঁক্ ফাঁক্ বোধ হতে লাগলো! এদিকে বোটওয়ালারাও চেপে হুউও ও হাততালি দিয়ে তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে দে গেল।

গুরুদাস নেশাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন, সুতরাং ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গেল, ইটি তিনি বরদাস্ত কত্তে পাল্লেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপনিই মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন। কেদার ও আর আর ইয়ারেরা

আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল।
গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোম্‌টার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝমঝমাবে মল॥

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন!

ঘণ্টাখানেক হল গুরুদাস নৌকা হতে গ্যাচেন, এমন সময় ব্রজ ও গোপাল ফিরে এলেন। তারা শহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথাও একজন মেয়েমানুষ পেলেন না; তাঁদের জানত ও শহরের ছুটো গোছের বাছতে বাকী করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে একেবারে মাথায় হাত

দিয়ে বসে পড়লেন, (জয়কেষ্টো মুখুয্যের জেলে যাওয়াতে তাঁর প্রজাদেরও এত দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটা মুণ্ড দেখে অশোকবনে সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন ?) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

হৃৎপিঞ্জরের পাখি উড়ে এল কার।
ত্বরা করে ধর্ গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার ॥
কোন্ কামিনীর পোষা পাখি, কাহারে দিয়েছে ফাঁকি,
উড়ে এল দাঁড় ছেড়ে শিকলিকাটা ধরা ভার ॥

এমন সময় গুরুদাসও এসে পড়লেন—গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান নাই পেলেন—তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যই জুটিয়ে থাকবে। এদিকে তাঁর ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তাঁরাই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান কত্তে পাল্লেন না, গুরুদাসবাবু আর ছেড়ে আসবেন না। এদিকে গুরুদাস নৌকোয় এসেই মেয়েমানুষ না দেখ্তে পেয়ে মহাদুঃখিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু নেশার এমনি অনির্বচনীয় ক্ষমতা যে, তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না; গুরুদাস পুনরায় ইয়ারদের স্তোক দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন। কিন্তু তিনি কোথায় গেলে পূর্ণমনোরথ হবেন, তা নিজেও জানতেন না, বোধ হয় তিনি যার অধীন ও আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বলতে পাত্তেন। গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দেখে তার ইয়ারেরাও তাঁর পেছুনে পেছুনে চললেন। কেবল নারাণ, ব্রজ ও কেদার নৌকোয় বসে অত্যন্ত দুঃখেই—

নিশি যায় হায় হায় কি করি উপায়।
শ্যাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায় !!
হের হের শশধর অস্তাচল গত সখি,
প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিনমুখী,
আর কি আসিবে কান্ত তুষিতে আমায় ॥

গাইতে লাগলেন—মাজিরা 'জুয়ার বই যায়' বলে বারংবার ত্যক্ত কত্তে লাগলো। জলও ক্রমশ উড়োনচণ্ডীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো—ইয়ারদলের অসুখের পরিসীমা রইলো না !

গুরুদাস পুনরায় শহরটি প্রদক্ষিণ কল্লেন—সিঁদুরেপটি, শোভাবাজারের ও বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীতলাটাও দেখে গেলেন, কিন্তু কোনখানেই সংগ্রহ

কত্তে পাল্লেন না—শেষে আপনার বাড়িতে ফিরে গেলেন।

আমরা পূর্বেই বলেচি যে, গুরুদাসের এক বিধবা পিসী ছিল। গুরুদাস বাড়ি গিয়ে তাঁর সেই পিসীরে বললেন যে, 'পিসী! আমাদের একটা কথা রাখ্‌তে হবে।' তাঁর পিসী বললেন, 'বাপু গুরুদাস! কি কথা রাখতে হবে? তুমি একটা কথা বললে আমরা কি রাখবো না! আগে বল দেখি কি কথা?' গুরুদাস বললেন, 'পিসী যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে যাও, তা হলে বড় ভালো হয়। দেখ পিসী, সকলেই একটি দুটি মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্ছে, কিন্তু পিসী আমাদের একটিও মেয়েমানুষ জুটে উঠে নাই—দেখ পিসী সুদুই বা কেমন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জন্যে যেন না হল, কিন্তু পাঁচো ইয়ারের সুদু নিরিমিষষি রকমে যেতে মন সচ্চে না—তা পিসী আমোদ কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাধ্যি তোমারে কেউ কিছু বলে।' পিসী এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই গুঁই কত্তে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গেলেন।

ক্রমে পিসীকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌছলেন, নৌকোর ইয়াররা গুরুদাসকে মেয়েমানুষ নিয়ে আস্‌তে দেখে হুব্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কত্তে লাগলো, শেষে সকলে নৌকোয় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কষে ঝপাঝপ্‌ ঝপাঝপ্‌ করে দাঁড় বাইতে লাগলো, মাজি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝিঁকে মাত্তে লাগলো। গুরুদাস ও

সমস্ত ইয়ারে

ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্চে যমুনায়
গোপীর কুলে থাকা হল দায়।
আরে ও! কদম্‌তলায় বসি বাঁকা বাঁশরী বাজায়,
আর মুচ্‌কে হেসে নয়ন ঠারে কুলের বউ ভুলায়॥
হুড়র্‌ হো! হো! হো!

গাইতে লাগলেন, দেখতে দেখতে নৌকোখানি তীরের মত বেরিয়ে গেল। বড় বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ দুপুরের জোয়ারে নৌকো ছেড়েচেন। এদিকে জোয়ারও মরে এল, ভাঁটার সারানী পড়লো—নোঙ্গর করা ও খোঁটায় বাঁধা নৌকোগুলির পাছা ফিরে গেল—জেলেরা ডিঙি চড়ে বেঁউতি জাল তুলতে আরম্ভ কল্লে, সুতরাং যিনি যে অবধি গ্যাচেন, তাঁরে সেইখানেই নোঙ্গর কত্তে হল—তিলকাঞ্চনে বাবুদের পানসি, ডিঙি, ভাউলে, বজরা ও বোট্‌ বাজার পোট জায়গায় ভিড়ানো হল—গয়নার যাত্রীরা কিনেরার পাশে পাশে লগি মেরে চললেন। পেনেটি, কামারহাটি কিংবা খড়দয়ে জলপান করে খেয়া দিয়ে মাহেশ পৌছুবেন!

ক্রমে দিনমণি অস্ত গেলেন, অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুসরণে বেরুলেন, প্রিয়সখী প্রকৃত প্রিয় কার্যের অবসর বুঝে ফুলদাম উপহার দিয়ে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লেন, বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগলেন, বক ও বালহাঁসেরা শ্রেণী বেঁধে চললো, চক্রবাকমিথুনের কাল সময় প্রদোষ, সংসারের সুখ বর্ধনের জন্যে উপস্থিত হল। হায়! সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে কোন কোন বিষয় একের অপার দুঃখাবহ হলেও শতকের সুখাস্পদ হয়ে থাকে।

পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোন কোন গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা যেমন মেয়েদের সাঁজ সকালে ঘাটে যাবার পূর্বে পথের ধারের পুরনো শিবের মন্দির, ভাঙা কোটা, পুকুরপাড় ও ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে থাকে—তেমনি অন্ধকারও এতক্ষণ চাবি দেওয়া ঘরে, পাত্‌কোর ভেতর ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক ঘণ্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্তি দেখে রমণী-স্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট করে চক্ষু বুজে রইলেন, কিন্তু ফচ্‌কে ছুঁড়ীদের ঝাঁটা ভার—কুমুদিনীর মুখে হাসি আর ধরে না। নোঙ্গর করা ও কিনারার নৌকোগুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগলেন,

বোধ হতে লাগ্‌লো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে নাচতে লেগেচেন। বায়ুচালিত ঢেউগুলি তবলা বাঁয়ার কাজ কচ্চে—কোনখানে বালির খালের নীচে একখানি পিনেস নোঙ্গর করে বসেচেন—রকমারি বেখড়ক চলচে, গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পুরবী রাগিণীতে—

> যে যাবার সে যাক্‌ সখি আমি তো যাবো না জলে।
> যাইতে যমুনাজলে, সে কালা কদম্বতলে,
> আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে!

গান ধরেচেন, কোনখানে এইমাত্র একখানি বোট নোঙ্গর কল্লে—বাবু ছাতে উঠলেন, অমনি আর আর সঙ্গীরাও পেছনে পেছনে চললো; একজন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'চাচা! এ জায়গার নাম কি?' অমনি বোটের মাজি হজুরে সেলাম ঠুকে 'আইগেঁ কাশীপুর কর্তা! এই রতন বাবুর গাট' বলে বকশিশের উপক্রমণিকা করে রাখলে। বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখতে লাগলেন; ঘাটে অনেক বউ ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনি হাসি ও রসিকতায় ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হল, দু-একটা পোষ মান্‌বারও পরিচয় দ্যাখাতে ত্রুটি কল্লে না—মোসাহেব দলে মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত; বাবুর প্রধান ইয়ার রাগ ভেজে—

> অনুগত আশ্রিত তোমার।
> রেখো রে মিনতি আমার॥
> অন্য ঋণ হলে, বাঁচিতাম পলালে,
> এ ঋণে না মলে, পরিশোধ নাই।
> অতএব তার, ভার তোমার,
> দেখো রে করো নাকো অবিচার॥

গান জুড়ে দিলেন—সন্ধ্যা আহ্নিকওয়ালা বুড়ো বুড়ো মিন্‌সেরা, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে, নিষ্কর্মা মাগীরা ঘাটের উপর খাতা বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল; বাবুরাও উৎসাহ পেয়ে সকলে মিলে গাইতে লাগলেন—মড়া খেকো কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠ্‌লো, চরন্তী শোয়ারগুলো ময়লা ফেলে ভয়ে ভোঁৎ ভোঁৎ করে খোঁয়াড়ে পালিয়ে গেল।

কোন বাবুর বজরা বরানগরে পাটের কলের সামনেই নোঙ্গর করা হয়েচে,

গাঁয়ের বওয়াটে ছেলেরা বাবুদের রঙ্গ ও সঙ্গের মেয়েমানুষ দেখে ছোট ছোট নুড়ি পাথর, কাদা ও মাটির চাপ ছুঁড়ে আমোদ কত্তে লাগলো, সুতরাং সে ধারের খড়খড়েগুলো বন্ধ করতে হল—আরো বা কি হয়!

কোন বাবুর ভাউলেখানি রাসমণির নবরত্নের সামনে নোঙ্গর করেচে, ভেতরের মেয়েমানুষরা উঁকি মেরে নবরত্নটি দেখে নিচ্চে।

আমাদের নায়ক বাবু গুরুদাস বাগবাজারের পোলের আশেপাশেই আছেন; তাদের বাঁয়ার এখনো আওয়াজ শুনা যাচ্চে, আতুরী ও আনীসদের বেশীর ভাগ আনাগোনা হচ্চে—আনীস ও রমেদের মধ্যে যারা গেছেন, তারাই দুনো হয়ে বেরিয়ে আসচেন—ফুলুরি ও গোলাপী খিলিরা দেবতাদের মত বর দিয়ে অন্তর্ধান হয়েচেন, কারু কারু তপস্যার ফললাভও শুরু হয়েচে—স্নেহময়ী পিসী আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন, নৌকোখানি অন্ধকার।

এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি এল, একটা গোলমেলে হাওয়া উঠ্লো, নৌকোর পাছাগুলো দুল্তে লাগলো—মাজিরা পাল ও চট মাথায় দিয়ে বৃষ্টি নিবারণ কত্তে লাগলো, রাত্তির প্রায় দুপুর!

সুখের রাত্তির দেখতে দেখতেই যায়—ক্রমে সুখ-তারার সিঁতি পরে হাসতে হাসতে ঊষা উদয় হলেন, চাঁদ তারাদল নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ ঊষারে দেখে লজ্জায় ম্লান হয়ে কাঁপতে লাগলেন, কুমুদিনী ঘোমটা টেনে দিলেন, পুর্ব দিক্ ফর্সা হয়ে এল, 'জোয়ার আইচে' বলে মাজিরা নৌকা খুলে দিলে—ক্রমে সকল নৌকোয় সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুরে চললো। সকলখানিই এখনো রং পোরা, কোন কোনখানিতে গলাভাঙা সুরে—

> এখনও রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
> কিঞ্চিৎ বিলম্ব করে হোক্ নিশি অবসান॥
> যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝংকার দিত,
> কুমুদী মুদিত হত, শশী যেত নিজ স্থান॥

শোনা যাচ্চে। কোনখানি কফিনের মত নিঃশব্দ—কোনখানিতে কান্নার শব্দ—কোথাও নেশার গোঁ গোঁ ধ্বনি।

যাত্রীদের নৌকো চললো, জোয়ারও পেকে এল, মাল্লারা জাল ফেলতে আরম্ভ কল্লে—কিনারায় শহরের বড়মানুষের ছেলেদের টু কপি ধোপার গাধা দেখা দিলে। ভট্টচায্যিরা প্রাতঃস্নান কত্তে লাগলেন, মাগী ও মিন্সেরা লজ্জা মাথায় করে কাপড় তুলে হাগ্তে বসেচে, তরকারির বাজরা সমেত হেটোরা

বদ্দিবাটি ও শ্রীরামপুরে চললো, আড়খেয়ার পাটুনীরে সিকি ও আধ পয়সায় পার কত্তে লাগলো, বদর ও দফর গাজীর ফকিরেরা ডিঙেয় চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে, সূর্যদেব উদয় হলেন দেখে কমলিনী আহ্লাদে ফুটলেন, কিন্তু ইলিশ মাছ ধড়ফড়িয়ে মরে গেলেন। হায়! পরশ্রীকাতরদের—এই দশাই ঘটে থাকে। যে সকল বাবুদের খড়দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটি প্রভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাদের ভারী ধুম, অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার, কারু ক-দিনই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েস ও চোহেলের হদ্দ! বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ্ খেলাবার জন্যে পানসি তৈরি, হাজার টাকার বাচ্ হবে, এক মাস ধরে নৌকোর গতি বাড়াবার জন্যে তলায় চর্বি ঘষা হচ্চে ও মাজিদের লাল উর্দী ও আশু পেছুর বাদশাই নিশেন সংগ্রহ হয়েচে—গ্রামস্থ ইয়ারদল, খড়দর বাবুরা ও আর আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ! বোধ হয় বাদী মহিন্দর নফর—চীনেবাজারের ক্যাবিনেট মেকর—ভারী সৌখিন—শকের সাগর বললেই হয়!

এদিকে কোন কোন যাত্রী মাহেশ পৌঁছুলেন, কেউ কেউ নৌকাতেই রইলেন, দুই-একজন উপরে উঠ্‌লেন—মাঠে লোকারণ্য, বেদীমণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত লোকের ঠেল মেরেচে। এর ভেতরেই নানা প্রকার দোকান বসে গ্যাচে, ভিকিরিরা কাপড় পেতে বসে ভিক্ষে করচে, গায়েনরা গাচ্চে আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী ও বাঁয়া নিয়ে বোষ্টুমরা বিলক্ষণ পয়সা কুড়ুচ্চে। লোকের হর্‌রা, মাঠের ধুলো ও রোদের তাত একত্র হয়ে একটি চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত হয়েচে; অনেকে তাই দিল্লীর লাড্‌ডুর স্বাদে সাধ করে সেবা কচ্চেন।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর বেজে গেল। সূর্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্চে। গামছা, রুমাল, চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্চে না। জগবন্ধু চাঁদমুখ নিয়ে বেদীর উপর বসেচেন, চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় যাক্, প্রলয় তুফানে জেলেডিঙির তফ্‌রা খাওয়ার মত সমাগত কুমুদিনীদের দুর্দশা ছ্যাখে কে!

ক্রমে বেলা প্রায় একটা বেজে গেল। জগন্নাথের আর স্নান হয় না—দশ আনির জমিদার 'মহাশয়' বাবুরা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না। কিন্তু পচা আদা ঝালে ভরা—তাদের আর আসা হয় না, ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আশ পাশের গাছতলা, আমবাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে গেল, অনেকের সর্দিগর্মি উপস্থিত, কেউ কেউ শিঙে ফুঁকলেন,

অনেকেই ধুতরো ফুল দেখতে লাগলো। ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গেল, লোকের রল্লা দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্‌লো, সকলেই অস্থির। এমন সময় শোনা গেল, বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হল, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন! চিড়ে, দই, মুড়ি, মুড়কি, চাটিম কলা দেদার উঠ্‌তে লাগলো; খোস্‌পোশাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন। অনেকের আমোদেই পেট ভরে গ্যাচে, সুতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হল না। কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর তিনটে, শেষে চারটে বেজে গেল, বাচখেলা আরম্ভ হল—কার নৌকা আগে গিয়ে নিশেন নেয়, এরি তামাসা ভাখবার জন্যে সকল নৌকোই খুলে দেওয়া হল, অবশ্যই এক দল জিতলেন; সকলে জুটে হারের হাততালি ও জিতের বাহবা দিলেন, স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো। সকলে বাড়িমুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে লাগলো ততই গর্মিবোধ হতে লাগলো। শেষে কাশীপুরের চিনির কল, বালির ব্রিজ, কেউ পার হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উঠলেন, কেউ বাগবাজার ও আইরিটোলার ঘাটে নাবলেন। সকলেই বিষণ্ণ বদন—ম্লান মুখ; অনেককেই ধরে তুলতে হল; শেষ চার-পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড় মরে—ফিরৃতি গোলের দরুন আমরা গুরুদাসবাবুর নৌকোখানা বেছে নিতে পাল্লেম না।

হুতোম প্যাঁচার নকশা : দ্বিতীয় ভাগ

রথ

হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার; শেষে বিবেচনা মতে
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিংবা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহু মানে লব শির পাতি।

স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো, গুরুদাস গুঁই গুল্‌দার উড়ুনি পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত র‍্যাঁদা ও ঘিস্‌কাপ ধল্লেন। ক্রমে রথ এসে পড়লো। ফ্যাতো র‍্যাতো পরব প্রলয় বুড়ুটে; এতে ইয়ার্কির লেশ মাত্র নাই, সুতরাং শহরে রথ পার্বণে বড় একটা ঘটা নাই; কিন্তু কলিকাতায় কিছুই ফাঁক যাবার নয়; রথের দিন চিৎপুর রোড লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ছোট ছোট ছেলেরা বার্নিস-করা জুতো ও সেপাইপেড়ে ঢাকাই ধুতি পরে, কোমরে রুমাল বেঁধে, চুল ফিরিয়ে, চাকর-চাকরানীদের হাত ধরে, পয়নালার ওপর পোদ্দারের দোকানে ও বাজারের বারান্দায় রথ দেখতে দাঁড়িয়েচে। আদ্‌বয়সী মাগীরা খাতায় খাতায় কোরা ও কলপ দেওয়া কাপড় পরে রাস্তা জুড়ে চলেচে; মাটির জগন্নাথ, কাঁঠাল, তালপাতের ভেঁপু, পাখা ও শোলার পাখি বেধড়ক বিক্রি হচ্ছে; ছেলেদের দেখাদেখি বুড়ো বুড়ো মিন্‌সেরাও তালপাতের ভেঁপু নিয়ে বাজাচ্চেন; রাস্তায় ভোঁ পোঁ ভোঁ পোঁ শব্দের তুফান উঠেচে—ক্রমে ঘণ্টা, হরিবোল, খোল, খত্তাল ও লোকের গোলের সঙ্গে একখানা রথ এল—রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান, খুন্তি, ভেড়োং ও নেড়ীর কবি; তারপর বৈরাগীদের দু-তিন দল নিম্‌খাসা কেত্তন, তার পেছনে শকের সংকীর্তন গাওনা; দোয়ার দলের সঙ্গে বড় বড় আটচালার মত গোলপাতার ছাতা ও পাখা চলেচে, আশে আশে কর্মকর্তারা পরিশ্রান্ত ও গলদ্‌ঘর্ম—কেউ নিশান ও রেশালার মিলে ব্যতিব্যস্ত, কেউ পাখার বন্দোবস্তে বিব্রত, সখের সংকীর্তনওয়ালারা গোছসই বারান্দার নীচে, চৌমাথায় ও চকের সাম্‌নে থেমে থেমে গান করে

যাচ্চেন, পেছনে চোতাদারেরা চেঁচিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্চেন, দোয়ারেরা কি গাচ্চেন, তা তাঁরা ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পাচ্চেন না। দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তিভরে মাতলামো স্বরে

কে মা রথ এলি ?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চুড়োর উপর মুক্‌পোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা,
লোকের টানে চল্‌চে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাখা,
বেহদ্দ ছেনালি।

গানটি গেয়ে, 'মা রথ! প্রণাম হই মা!' বলে প্রণাম কল্লে। এদিকে রথ হেলতে দুলতে বেরিয়ে গেল; ক্রমে এই রকমে দু-চারখানা রথ দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে পড়লো—গ্যাস্ জ্বালা মুটেরা মই কাঁদে করে ছাখা দিলে, পুলিসের পাশের সময় ফুরিয়ে এল, দর্শকেরাও যে যার ঘরমুখো হলেন।

মাহেশে স্নানযাত্রায় যে প্রকার ধুম হয়, রথে তত হয় না বটে, তবু ফ্যালা যায় না!

এদিকে সোজা ও উল্‌টো রথ ফুরালো, শ্রাবণ মাসে ঢ্যালা ফ্যালা পার্বণ, ভাদ্র মাসের অরন্ধন ও জন্মাষ্টমীর পর অনেক জায়গায় প্রিতিমের কাঠামোয় ঘা পড়লো, ক্রমে কুমোররা নায়েকবাড়ি একমেটে, দোমেটে ও তেমেটে করে বেড়াতে লাগলো। কোলা ব্যাঙেরা ক্রোড়্ কোঁ ক্রোড়্ কোঁ ক্রোড়্ কোঁ শব্দে আগমনী গাইতে লাগলো; বর্ষা আঁবের আঁটি, কাঁঠালের ভুতুড়ি ও তালের এঁশো খেয়ে বিদেয় হলেন—দেখতে দেখতে পুজো এল!

দুর্গোৎসব বাংলা দেশের পরব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই, বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দরের আমল হতেই বাংলায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পুর্বে রাজারাজড়া ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়িতেই কেবল দুর্গোৎসব হত, কিন্তু আজকাল পুঁটে তেলীকেও প্রিতিমা আনতে দেখা যায়; পুর্বকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়লো; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গেল, জায়গায় জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অস্থরের ঢাল তলোয়ার, নানা রঙের

ছোবানো প্রিতিমের কাপড় ঝুলতে লাগলো ; দর্জীরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটি নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে ; 'মধু চাই !' 'শাখা নেবে গো !' বলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুচ্চে। . ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটি, চুমকি ঘটি ও পেতলের থালা ওজন হচ্চে। ধূপ ধুনো, বেনে মসলা ও মাথাঘষার এক্‌স্ট্রা দোকান বসে গ্যাচে। কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দা ফেলেচে ; দোকান ঘর অন্ধকার প্রায়, তারি ভেতরে বসে যথার্থ পাই লাভে বউনি হচ্চে। সিঁদুর-চুপড়ি, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে অ্যাকুডক্টের উপর বার দিয়ে বসেচে। বাঙাল ও পাড়াগেঁয়ে চাকরেরা আরশি, ঘুন্‌সি, গিল্‌টির গয়না ও বিলিতি মুক্তো একচেটেয় কিন্‌চেন ; রবারের জুতো, কমফরটর, ষ্টিক ও ন্যাজওয়ালা পাগড়ি অগুন্তি উঠচে ; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ি, আঙ্গিয়া, বিলিতি সোনার শিল আংটি ও চুলের গার্ডচেনের অসঙ্গত খদ্দের। এত দিন জুতোর দোকান ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পুজোর মরশুমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠচে ; দোকানের কপাটেই কাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গীন কাগজ মারা হয়েচে, ভেতরে চেয়ার পাড়া, তার নীচে এক টুকরো ছেঁড়া কারপেট। শহরের সকল দোকানেরই শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আসচে, ততই বাজারের কেনা ব্যাচা বাড়চে, ততই কলকেতা গরম হয়ে উঠ্‌চে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে।
কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁদচুরি, কোনখানে ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে দু-ভরি রূপো গাঁটকাটায় কেটে নিয়েচে ; কোথাও মাগীর নাক থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে, পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিস বদমাইশ পোরা, চোরেরা পুজোর মরশুমে দেদার কারবার ফালাও কচ্চে, 'লাগে তাক্ না লাগে তুক্কো' 'কিনি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার' তাদের জপমন্ত্র হয়েচে ; অনেকে পার্বণের পূর্বে শ্রীঘরে ও বাঙ্কুলে বসতি কচ্চে ; কারো পুজোয় পাথরে পাঁচ কিল ; কারো সর্বনাশ ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়লো।
এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে পুজার ভারী ধুম। প্রতিপদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে

বাড়ি গিস্‌গিস্‌ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপর তসরকাপড় পরে বার

দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়লংকার সভাপণ্ডিত, অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসানিঃসৃত রঙ্গীন কফজল জাজিমে পুচ্চেন। এদিকে জহুরী জড়োয়া গহনার পুঁটুলি ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে, মুন্‌শী মশাই, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা ফর্দ কচ্চেন, সামনে কতকগুলি প্রিতিমেফ্যালা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক 'যে আজ্ঞা' 'ধর্ম অবতার' প্রভৃতি প্রিয়বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। কেউ খোসগল্প ও অন্য বড়মানুষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জনের উপক্রমণিকা কচ্চেন,—আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে রয়েচে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে। আতর-ওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারান্দায় ঘুচ্চে—পুজো যায় তথাচ তাদের হিসেব নিকেশ হচ্চে না। সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্যি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ি চেনেন না; বিধবা বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বললে হয়! কিন্তু বানের মুখে জেলেডিঙির মত তাঁদের কথা তল্‌ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্তে

সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্নে, নাতজামাই, দৌত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাঁসিল কচ্চেন ; এদিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাপ দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজ্‌রের পর বাবু কাকেও 'আজ যাও' 'কাল এসো' 'হবে না' 'এবার এই হল' প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরীসরকারের হেকমত ছাখে কে ! সকলেই শশব্যস্ত, পুজার ভারী ধুম !

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হল, পঞ্চমী প্রভাত হলেন—ময়রারা তুর্গোমোণ্ডা ও আগাতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ কল্লে। পাঁঠার রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট বাজারে প্যারেড কত্তে লাগ্‌লো, গন্ধবেনেরা মসলা ও মাথাঘষা বেঁধে বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আজ শহরের বড় রাস্তায় চলা ভার ; মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইচে, দোকানে খদ্দের বসবার স্থান নাই। পঞ্চমী এইরূপে কেটে গেল। আজ ষষ্ঠী ; বাজারে শেষ কেনাবেচা, মহাজনের শেষ তাগাদা, আশার শেষ ভরসা। আজ আমাদের বাবুর বাড়িরও অপূর্ব শোভা ; সব চাকর-বাকর নতুন তকমা, উর্দী ও কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্চে, দরজার তুই দিকে পুর্ণকুম্ভ ও আম্রসার দেওয়া হয়েচে, ঢুলীরা মধ্যে মধ্যে রোশনচৌকি ও শানাইয়ের সঙ্গে বাজাচ্চে, জামাই ভাগ্নে বাবুরা নতুন জুতো ও নতুন কাপড় পরে ফররা দিচ্ছেন, বাড়ির কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওয়া হচ্চে, কোথাও নতুন তাসজোড়া পরকানো হচ্চে, সমবয়সী ও ভিক্ষুকের মেলা লেগেচে, আতরের উমেদারেরা বাবুদের কাছে শিশি হাতে করে সাত দিন ঘুচ্চে, কিন্তু বাবুদের এমনি অনবকাশ যে তু-ফোঁটা আতর দানের অবসর হচ্চে না।

এদিকে শহরের বাজারের মোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজন্দারের ভিড়ে সেঁদোনো ভার। রাজপথ লোকারণ্য ; মালীরা পথের ধারে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্লিপত্তর ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে বসেচে ; দইয়ের ভাঁড়, মণ্ডার খুলি ও লুচি-কচুরীর ওড়ায় রাস্তা জুড়ে গেছে ; রেও ভাট ও আমাদের মত ফলারেরা মিমো করে নিচ্চে—কোথায় যায় ?

ষষ্ঠী সন্ধ্যায় শহরে প্রিতিমার অধিবাস হয়ে গেল, কিছুক্ষণ ঢোল ঢাকের শব্দ থাম্‌লো, পুজোবাড়িতে ক্রমে 'আন্‌ রে' 'কর রে' 'এটা কি হল' কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্বরী অবসন্না হল, সুখতারা মৃতু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখিরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ করতে আরম্ভ কল্লে ; সেই সঙ্গে শহরের চারিদিকে বাজনা বাদ্দি বেজে উঠলো, নবপত্রিকার

স্নানের জন্যে কর্মকর্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগ্‌লো, যেন সপ্তমী কোর-মাখানো নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন।

এদিকে শহরের সকল কলাবউয়েরা বাজনা বাদ্দি করে স্নান করতে বেরুলেন, বাড়ির ছেলেরা কাঁসর ও ঘটি বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চললো—এদিকে বাবুর কলাবউয়ের স্নানের সরঞ্জাম বেরুলো, আগে আগে কাড়ানাগরা, ঢোল, সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চললো, তার পেছনে নতুন কাপড় পরে আশাসোঁটা হাতে বাড়ির দরোয়ানেরা, তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁথি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ির আচার্য বামুন, গুরু, ও সভাপণ্ডিত, তার পশ্চাৎ বাবু,

বাবুর মস্তকে লাল সাটিনের রূপোর রামছাতা ধরেচে। আশে পাশে ভাগ্নে, ভাইপো ও জামাইয়েরা, পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগ্নীপতি, মোসাহেব ও বাজে দল, তার শেষে নৈবিদ্য, লণ্ঠন ও পুষ্পপাত্র, শাঁখ, ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পুজার সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই প্রকার সরঞ্জামে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটে কলাবউ নাওয়াতে চললেন, ক্রমে ঘাটে পৌছুলে কলাবউয়ের পুজো ও স্নানের অবকাশে হজুরও গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে স্তব পাঠ কত্তে কত্তে অনুরূপ বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বাড়িমুখো হলেন।

পাঠকবর্গ! এ শহরে আজকাল দু-চার এজুকেটেড ইয়ংবেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পুজো আচ্চা

করে থাকেন—ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে কতকগুলি দিল্‌দোস্ত মদে ভাক্তে প্রসাদ পান, আলাপী ফিমেল ফ্রেণ্ডরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন, পুজোরও কিছু রিফাইণ্ড কেতা। কারণ অপর হিন্দুদের বাড়ি নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রণামী টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য, কিন্তু এদের বাড়ি প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকৌউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা হয়; প্রতিমের সামনে বিলিতি চর্বির বাতি জ্বলে ও পুজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার আলাউয়েন্স থাকে। বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমে সাজানো হয়—মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট্ পরেন, স্যাণ্ডউইচের শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্তে কাতলীকরা গরম জলে স্নান করে থাকেন, শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্মকর্তার প্রাতরাশের টি ও কফি প্রস্তুত হয়!

ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। এদিকে পুজোও আরম্ভ হল, চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণ্ডাওয়ালা নৈবিদ্যি সাজানো হল, সঙ্গতি বুঝে চেলীর শাড়ি, চিনির থাল, ঘড়া, চুমকি ঘটি ও সোনার লোহা; নয়তো কোথাও সন্দেশের পরিবর্তে গুড় ও মধুপর্কের বাটির বদলে খুবির ব্যবস্থা। ক্রমে পুজো শেষ হল; ভক্তরা এতক্ষণ অনাহারে থেকে পুজোর শেষে প্রতিমারে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, বাড়ির গিন্নীরা চণ্ডী শুনে জল খেতে গেলেন; কারো বা নবরাত্তির। আমাদের বাবুর বাড়ির পুজোও শেষ হল প্রায়, বলিদানের উদ্‌যোগ হচ্চে; বাবু মায় স্টাফ্ আদুড় গায়ে উঠোনে দাঁড়িয়েচেন, কামার কোমর বেঁধে প্রতিমের কাছ থেকে পুজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে কানে আশীর্বাদী ফুল গুঁজে হাড়িকাঠের কাছে উপস্থিত হল, পাশ থেকে একজন মোসাহেব 'খুঁটি ছাড়! খুঁটি ছাড!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়িকাঠে পুরে দিয়ে খিল এঁটে দেওয়া হল, একজন পাঁঠার মুড়ি ও আর একজন ধড়টা টেনে ধরলে—অমনি কামার 'জয় মা! মা গো!' বলে কোপ তুললে, বাবুরাও সেই সঙ্গে 'জয় মা! মা গো!' বলে প্রতিমের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগ্‌লেন—ছপ্ করে কোপ পড়ে গেল—গীজ্জা গীজ্জা গীজ্জা গীজ্জা, নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্, গীজ্জা গীজ্জা গীজ্জা গীজ্জা, নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্ শব্দে ঢোল, কাড়ানাগরা ও ট্যাম্‌টেমি বেজে উঠ্‌লো; কামার সরাতে সমাংস করে দিলে পাঁঠার মুড়ির মুখ চেপে ধরে দালানে পাঠানো হল, এদিকে একজন মোসাহেব সন্তর্পণে খর্পরের সরা আচ্ছাদন করে প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত করলে, বাবুরা বাজনার তরঙ্গের

মধ্যে হাততালি দিতে দিতে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে উঠলেন—প্রতিমার সামনে দানের সামগ্রী ও প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হলে আরতি আরম্ভ হল, বাবু স্বহস্তে ধবল গঙ্গাজল চামর বীজন কত্তে লাগলেন, ধূপ ধুনোর ধোঁয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। এইরূপে আধ ঘণ্টা আরতির পর শাঁখ বেজে উঠ্‌লো, সবাবু সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বৈঠকখানায় গেলেন। এদিকে দালানে বামুনেরা নৈবিদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি কত্তে লাগ্‌লো। দেখতে দেখতে সপ্তমীও ফুরালো। ক্রমে নৈবিদ্যি বিলি, কাঙালী বিদায় ও জলপান বিলানোতেই সে দিনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিকক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হল—জগা স্যাকৃরা চণ্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল, সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের প্রকৃত গায়ক নাই; বিশেষতঃ এক্ষণে শ্রোতাও অতিদুর্লভ হয়েচে।

ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জ্বেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি আরম্ভ করে দেওয়া হল এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অন্যান্য সরঞ্জামও সেই সময় দালানে সাজিয়ে দেওয়া হল—মা দুর্গা যত খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা করলেই বাবুব দশ টাকা খরচের সার্থকতা হবে! এদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে দর্শকেব ভিড় বাড়তে লাগলো, বাঙাল দোকানদার, ঘুস্কি ও খানকীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও আদ্‌বয়সী ছোঁড়া সঙ্গে খাতায় খাতায় প্রতিমে দেখতে আসতে লাগ্‌লো। এদিকে নিমন্ত্রিতেরা সেজেগুজে এসে টনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম করলে, অমনি পুরুত এক ছড়া ফুলের মালা নেমন্তন্নের গলায় দিয়ে টাকাটা কুড়িয়ে ট্যাঁকে গুঁজলেন, নেমন্তন্নেও হন্‌ হন্‌ করে চলে গেলেন। কলকেতা শহরের এই একটি বড় আজগুবী কেতা, অনেক স্থলে নিমন্ত্রিত ও কর্মকর্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাৎও হয় না, কোথাও পুরোহিত

বলে দ্যান 'বাবুরা উপরে, ঐ সিঁড়ি মশাই যান না!' কিন্তু নিমন্ত্রিত যেন চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারেই 'আজ্ঞে না, আরো পাঁচ জায়গায় যেতে হবে, থাক্‌' বলে টাকাটি দিয়েই অমনি গাড়িতে ওঠেন; কোথাও যদি কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে গিরগিটের মত উভয়ে একবার ঘাড় নাড়ানাড়ি মাত্র

হয়ে থাকে—সন্দেশ মেঠাই চুলোয় যাক্, পান তামাক মাথায় থাক্, প্রায় সর্বত্রই সাদর সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল—দুই-এক জায়গায় কর্মকর্তা জরির মছলন্দ পেতে, সামনে আতরদান, গোলাপপাশ সাজিয়ে পয়সার দোকানের পোদ্দারের মত বসে থাকেন। কোন বাড়ির বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈচৈয়ের তুফানে নেমন্তন্নের সেঁধুতে ভরসা হয় না—পাছে কর্মকর্তা তেড়ে কামড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানা অন্ধকার, হয়তো বাবু ঘুমুচ্চেন, নয় বেরিয়ে গ্যাচেন, দালানে জনমানব নাই, নেমন্তন্নে কার সমুখে যে প্রণামী টাকাটি ফেল্‌বেন ও কি কর্‌বেন, তা ভেবে স্থির কত্তে পারেন না, কর্মকর্তার ব্যাভার দেখে প্রতিমে পর্যন্ত অপ্রস্তুত হন। অথচ এ রকম নিমন্ত্রণ না করলেই নয়। এর দরুন অনেক ভদ্রলোক আজকাল আর 'সামাজিক' নেমন্তন্নে স্বয়ং যান না, ভাগ্নে বা ছেলেপুলের দ্বারাতেই ক্রিয়ে-বাড়ির পুরুতের প্রাপ্য কিংবা বাবুদের ওতকরা টাকাটি পাঠিয়ে দ্যান কিন্তু আমাদের ছেলেপুলে না থাকায় ও স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেছি, এবার অবধি প্রণামীর টাকায় পোস্টেজ্ স্ট্যাম্প কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেবো, তেমন তেমন আত্মীয়স্থলে (সেফ অ্যারাইভ্যালের জন্যে) রেজস্টরী করে পাঠানো যাবে; যে প্রকারে হোক্, টাকাটি পৌঁছনো নে বিষয়। অধ্যাপক ভায়ারা এ বিষয়ে অনেক সুবিধে করে দিয়েচেন, পুজো ফুরিয়ে গেলে তাঁরা প্রণামীর টাকাটি আদায় কত্তে স্বয়ং ক্লেশ নিয়ে থাকেন, নেমন্তন্নের পূর্ব হতে পুজোর শেষে তাঁদের আত্মীয়রা আরও বৃদ্ধি হয়, অনেকের প্রণামী চাইতে আসাই পুজোর প্রুফ!

মনে করুন, আমাদের বাবু বনেদী বড়মানুষ; চাইল স্বতন্তর, আরতির পর বানারসী জোড় পরে সভাসদ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেন, অমনি তক্‌মা পরা বাঁকা দরওয়ানেরা তলোয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগ্‌লো; হরকরা, হুঁকোবর্দার, বিবির বাড়ির বেয়ারা ও মোসাহেবরা জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো কখন কি ফরমাস হয়। বাবুর সামনে একটা সোনার আলবোলা, ডাইনে একটা পান্নাবসানো ফুরসি, বাঁয়ে একটা হীরে বসানো টোপ্‌দার গুড়গুড়ি ও পেছনে একটা মুক্তোবসানো পেঁচুয়া পড়লো; বাবু আঁস্তাকুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আশে পাশে মুখ দিচ্চেন ও আড়ে আড়ে সামনে বাজে লোকের ভিড়ের দিকে দেখচেন—লোকে কোন্‌টার কারিগরির প্রশংসা কচ্চে; যে রকমে হোক, লোককে দেখানো চাই যে, বাবুর রূপো সোনার জিনিস অঢেল,

এমন কি, বসাবার স্থান থাকলে আরো দুটো ফুরসি বা গুড়গুড়ি ছাখানো যেতো। ক্রমে অনেক অনাহূত নিমন্ত্রিত জড়ো হতে লাগ্‌লেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গেল, জুতো চোরে সেই লাঙ্গা তরোয়ালের পাহারার ভেতর থেকেও দু-ঝুড়ি জুতো সরিয়ে ফেললে। কচ্ছপ জলে থেকেই ডাঙাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে আপনার জুতোরও উপর নজর রেখেছিলেন; কিন্তু ওঠবার সময় ছ্যাখেন যে, জুতোরাম কচ্ছপের ডিমের মত ফুটে সরেচেন, ভাঙা ডিমের খোলার মত হয়তো এক পাটি ছেঁড়া চটি পড়ে আছে।

এদিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গেল; ছেলেরা 'ব্যোমকালী কল্‌কেত্তাওয়ালী' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। বাবুর বাড়ি নাচ, সুতরাং বাবু আর অধিকক্ষণ দালানে বসতে পাল্লেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গেলেন, এদিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জ্বেলে দিয়ে মজলিসের উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো, ভাগ্নেরা ট্যাস্‌ল্‌ দেওয়া টুপি ও পেটি পরে ফপরদালালি কত্তে লাগ্‌লেন। এদিকে দুই-একজন নাচের মজলিসি নেমন্তন্নে আসতে লাগ্‌লেন। মজলিসে তয়ফা নাবিয়ে দেওয়া হল। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জড়োয়া গহনায় ভূষিত হয়ে ঠিক একটি 'ঈজিপশন্‌ মমী' সেজে মজলিসে বার দিলেন—বাই সারঙ্গের সঙ্গে গান করে সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগ্‌লেন!

নেমন্তন্নেরা নাচ দেখতে থাকুন, বাবু ফররা দিন ও লাল চোখে রাঙা উজীব মারুন—পাঠকবর্গ একবার শহরটার শোভা দেখুন—প্রায় সকল বাড়িতেই নানা প্রকার রং তামাসা আরম্ভ হয়েচে। লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পুজো দেখে বেড়াচ্চে। রাস্তায় বেজায় ভিড়! মারোয়াড়ী খোট্টার পাল, মাগীর খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে। নেমন্তন্নের হাত-লণ্ঠনওয়ালা বড় বড় গাড়ির সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্‌ পইস্‌ কচ্চে, অথচ গাড়ি চালাবার বড় বেগতিক! কোথায় সখের কবি হচ্চে, ঢোলের চাঁটি ও গাওনার চিৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েচেন, গানের তানে ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে উঠ্‌চে। কোথাও পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিল্‌ ইয়ার ছোকরারা ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাটুচেন ও আপনা আপনি বাহবা দিচ্চেন; রাত্তির শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিসে দক্ষিণা দেবে। কোথায় যাত্রা হচ্চে, মণিগোঁসাই

সং এসেচে, ছেলেরা মণিগোঁসায়ের রসিকতায় আহ্লাদে আটখানা হচ্চে, আশে পাশে চিকের ভেতর মেয়েরা উঁকি মাচ্চে, মজলিসে রামমশাল জল্‌চে, বাজে দর্শকদের বাতকর্ম ও মশালের দুর্গন্ধে পুজোবাড়িতে তিষ্ঠনো ভার, ধুপ ধুনোর গন্ধও হার মেনেচে। কোনখানে পুজোবাড়ির বাবুরাই খোদ মজলিস রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাঙ নাপানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেচেন; এক এক বারের হাসির গর্‌রায়, শিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ানো পরিত্যাগ করে ন্যাজ গুটিয়ে পালাবার পথ দেখ্‌চে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত! এদিকে শহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়িই আলোময়।

এই প্রকারে সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপুজো কেটে গেল। আজ নবমী; আজ পুজোর শেষ দিন; এত দিন লোকের মনে যে আহ্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়তেছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা।

আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও নব্বুইটা পাঁঠা, সুপারী, আক, কুমড়ো, মাগুর মাছ ও মরীচ বলিদান হয়েচে; কর্মকর্তা পাত্র টেনে পাঁচো ইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটি কচ্চেন, ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠানে লোকারণ্য; উপর থেকে বাড়ির মেয়েবা উঁকি মেরে নবমী দেখচেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যাচে, কার সাধ্য প্রবেশ করে—কাঙালী, রেওভাট ও ভিক্ষুকের পুজোবাড়ি ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্যন্ত ফিরে যাচ্চে। ক্রমে দেখতে দেখতে দিনমণি অস্ত গেলেন, পুজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো! ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়া গাওনা হল। ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগ্‌লো, শেষে বিসর্জনের সমারোহ শুরু হল—আজ নিরঞ্জন।

ক্রমে দেখতে দেখতে দশটা বেজে গেল; দইকদমা ভোগ দিয়ে প্রতিমার নিরঞ্জন করা হল, আরতির পর বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠ্‌লো; বামুনবাড়ির প্রতিমারা সকালেই জলসই হলেন। বড়মানুষ ও বাজে জাতের প্রতিমা পুলিসের পাশমত বাজনা বাদ্যির সঙ্গে বিসর্জন হবেন—এদিকে এ কাজ সে কাজে গির্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করে দুপুর বেজে গেল, সূর্যের মৃদু তপ্ত উত্তাপে শহর নিম্‌কি রকম গরম হয়ে উঠ্‌লো, এলোমেলো হওয়ায় রাস্তার

ধুলো ও কাঁকর উড়ে অন্ধকার করে তুললে। বেকার কুকুরগুলো দোকানের পাটাতনের নীচে ও খানার ধারে শুয়ে জিব বাইর করে হাঁপাচ্চে, বোঝাই গাড়ির গোরুগুলোর মুখ দে ফ্যানা পড়চে—গাড়োয়ান ভয়ানক চিৎকারে 'শালার গোরু চলে না' বলে ন্যাজ মলচে ও পাঁচনবাড়ি মাচ্চে; কিন্তু গোরুর চাল বেগড়াচ্চে না, বোঝাইয়ের ভারে চাকাগুলি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলেচে। চড়াই ও কাকগুলো বারান্দা, আল্‌সে ও নলের নীচে চক্ষু মুদে বসে আছে। ফিরিওয়ালারা ক্রমে ঘরে ফিরে যাচ্চে, রিপুকর্ম ও পরামানিকরা অনেকক্ষণ হল ফিরেচে; আলু, পটোল! ঘি চাই! ও তামাকওয়ালা কিছু-ক্ষণ হল ফিরে গ্যাচে। ঘোল চাই মাখন চাই! ভয়সা দই! ও মালাই দইওয়ালারা কড়ি ও পয়সা গুন্‌তে গুন্‌তে ফিরে যাচ্চে, এখন কেবল মধ্যে মধ্যে পানিফল! কাগোজ বদোল! পেয়ালা পিরিচ—বিলাতী খেলেনা বর্তন চাই—পেয়ালা পিরিচ! ফিরিওয়ালাদের ডাক শোনা যাচ্চে—নৈবিদ্যি মাথায় পুজোবাড়ির লোক, পুজুরী বামুন, পটো ও বাজন্দার ভিন্ন রাস্তায় বাজে লোক নাই। গুপুস্ করে একটার তোপ পড়ে গেল। ক্রমে অনেক স্থলে ধুমধামে বিসর্জনের উদ্‌যোগ হতে লাগলো।

হায়! পৌত্তলিকতা কি শুভ দিনেই এস্থলে পদার্পণ করেছিল; এত দেখে শুনে মনে স্থির জেনেও আমরা তারে পরিত্যাগ কত্তে কত কষ্ট ও অসুবিধা বোধ কচ্চি; ছেলেবেলা যে পুতুল নিয়ে খেলাঘর পেতেচি, বৌ বৌ খেলেচি ও ছেলে মেয়েব বে দিয়েচি, আবার বড় হয়ে সেই পুতুলকে পরমেশ্বর বলে পুজো কচ্চি, তাঁর পদার্পণে পুলকিত হচ্চি ও তাঁর বিসর্জনে শোকের সীমা থাকচে না—শুধু আমরা কেন—কত কত কৃতবিদ্য বাঙালী সংসারের ও জগদীশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব অবগত থেকেও হয়তো সমাজ না হয় পরিবার পরি-জনের অনুরোধে পুতুল পুজে আমোদ প্রকাশ করেন, বিসর্জনের সময় কাঁদেন ও কাদা রক্ত মেখে কোলাকুলি করেন, কিন্তু নাস্তিকতায় নাম লিখিয়ে বনে বসে থাকাও ভালো, তবু 'জগদীশ্বর একমাত্র' এটি ভেনে আবার পুতুল পুজায় আমোদ প্রকাশ করা উচিত নয়।

ক্রমে শহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, বেশ্যালয়ের বারান্দা আলাপীতে পুরে গেল, ইংরাজি বাজ্‌না, নিশেন, তুরুকসোয়ার ও সার্জেন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন—তখন 'কার প্রতিমা উত্তম' 'কার সাজ ভালো' 'কার সরঞ্জাম সরেস' প্রভৃতির প্রশংসারই

প্রয়োজন হচ্চে, কিন্তু হায়! 'কার ভক্তি সরেস' কেউ সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে না—কর্মকর্তাও তার জন্যে বড় কেয়ার করেন না। এদিকে প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট ভদ্দরলোক গোছের দর্শক, ক্ষুদে ক্ষুদে পোশাক করা ছেলে, মেয়ে ও ইস্কুলবয়ে ভরে গেল। কর্মকর্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচ খেলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন—আমুদে মিন্‌সে ও ছোঁড়ারা নৌকোর উপর ঢোলের সঙ্গতে নাচতে লাগ্‌লো। সৌখীন বাবুরা খ্যাম্‌টা ও বাই সঙ্গে করে বোট, পিনেস ও বজ্‌রার ছাতে বার দিয়ে বস্‌লেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু-একটা রংদার গান গাইতে লাগ্‌লো :

বিদায় হও মা ভগবতী এ শহরে এসো নাকো আর।
দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম দেখি চমৎকার ॥
জস্টিসেরা ধর্মঅবতার, কায়মনে কচ্চেন সুবিচার।
এদিকে ধুলোর তরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চেয়ে চলা ভার।
পথে হাগা মোতা চলবে না, লহোরের জল তুলতে মানা,
লাইসেন্সটেক্স মাথট চাঁদা, পাইখানার বাসী ময়লা রবে না।
হেল্‌থ অফিসর, সেতখানার মেজেস্টর,
ইন্‌কমের আসেসর মাললে সবারে ;
আবার গবর্নরের গুয়ে দৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার !
অসহ্য হতেছে মা গো ! অসাধ্য বাস করা আর।
জীয়ন্তে এই তো জ্বালা মা গো !
মলেও শান্তি পাবে না,
মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে করবে সৎকার।
হুতোম দাস তাই শহর ছেড়ে আস্‌মানে করেন বিহার।

এদিকে দেখতে দেখতে দিদিমণি যেন সম্বৎসরের পুজোর আমোদের সঙ্গে অস্ত গেলেন। সন্ধ্যাবধূ বিচ্ছেদবসন পরিধান করে দেখা দিলেন। কর্মকর্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িয়ে 'দাদা গো' 'দিদি গো' বাজনার সঙ্গে ঘট নিয়ে ঘরমুখো হলেন। বাড়িতে পৌঁছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণঘটকে প্রণাম করে শান্তিজল নিলেন, পরে কাঁচা হলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পর কোলাকুলি কল্লেন। অবশেষে কলাপাতে দুর্গানাম লিখে সিদ্ধি খেয়ে বিজয়ার উপসংহার হল। ক-দিন মহাসমারোহের পর আজ শহরটা

খাঁ খাঁ কত্তে লাগ্‌ল—পৌত্তলিকের মন বড়ই উদাস হল, কারণ লোকের যখন সুখের দিন থাকে তখন সেটি তত অনুভব করতে পারা যায় না, যত সেই সুখের মহিমা দুঃখের দিনে বোঝা যায়।

রামলীলা

দুর্গোৎসব এক বছরের মত ফুরুলো। ঢুলীরা নায়েকবাড়ি বিদেয় হয়ে শুঁড়ীর দোকানে রং বাজাচ্চে। ভাড়া-করা ঝাড়েরা মুটের মাথায় বাঁশে ঝুলে টুনু টুনু শব্দে বালাখানায় ফিরে যাচ্চে। যজ্‌মেনে বামুনের বাড়ির নৈবিদ্যির আলোচাল ও পঞ্চশস্য শুকুচ্চে, ব্রাহ্মণী ছেলে কোলে করে কাঠি নিয়ে কাক তাড়াচ্চেন। শহরটা থম্‌থমে। বাসাড়েরা আজো বাড়ি হতে ফেরেননি, আপিস ও ইস্কুল খোলবার আরো চার-পাঁচ দিন বিলম্ব আছে।

যে দেশের লোকের যে প্রকার হেম্মৎ থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্মকাণ্ড, আমোদ প্রমোদ ও কার কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল ওয়েদর-ককের কাজ করে। দেখুন, আমাদের পুর্বপুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ কত্তেন, নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখতেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; কিন্তু আজকাল আমরা বারোইয়ারিতলায় নয় বাড়িতে, বেদেনীর নাচ ও 'মদন আগুনের' তানে পরিতুষ্ট হচ্চি, ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে পুতুল নাচ, পাঁচালি ও পচা খেঁউড়ে আনন্দ প্রকাশ কচ্চি, যাত্রাওয়ালাদের 'ছকুবাবু' ও 'সুন্দরের' সং নাবাতে হুকুম দিচ্ছি। মল্লযুদ্ধের তামাসা দেখ 'বুলবুল্ ফাইট' ও 'ম্যাড়ার লড়ায়ে' পর্যবসিত হয়েচে। আমাদের পুর্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজকাল আমরা সর্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষের 'খেঁউড়ে' জিত ধরাই আছে।

আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবে না কেন? আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুমঝুমি, চুষি ও শোলার পাখিতে বর্ণপরিচয় করে থাকি, কিছু পরে ঘুড়ি লাটিম, লুকোচুরি ও বৌ বৌ খেলাই আমাদের যুবত্বের এনট্রান্স কোর্স হয়, শেষে তাস, পাশা ও বড়ে টিপে মাত করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই। সুতরাং ঐগুলি পুরনো পড়ার মত কেবল চিরকাল আউড়ে আসতে হয়; বেশীর ভাগ বয়সের পরিমাণের সঙ্গে ক্রমশ কতকগুলি আনুষঙ্গিক উপসর্গ উপস্থিত হয়।

রামলীলা এদেশের পরব্ নয়—এটি প্রলয় খোট্টাই। কিছু কাল পুর্বে চার্নকের সেপাইদের দ্বারা এই রামলীলার সূত্রপাত হয়, পুর্বে তারাই আপনা আপনি চাঁদা করে চার্নকের মাঠে বামরাবণের যুদ্ধের অভিনয় কত্তো; কিছু দিন এ রকমে চলে, মধ্যে একেবারে রহিত হয়ে যায়। শেষে বড়বাজারের দু-চার ধনী খোট্টার উদ্যোগে ১৭৫৭ শকে পুনর্বার 'রামলীলা' আরম্ভ হয়। তদবধি এই বারো বৎসর, রামলীলার মেলা চলে আস্চে। কল্কেতায় আর অন্য কোন মেলা নাই বলেই অনেকে রামলীলায় উপস্থিত হন। এদের মধ্যে নিষ্কর্মা বাবু, মারোয়াড়ী খোট্টা, বেশ্যা ও বেনেই অধিক।

পাঠকবর্গ মনে করুন, আপনাদের পাড়ার বনেদী বড়মানুষ ও দলপতি বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপর বার দিয়ে বসেচেন। গদির সামনে বড় বড় বাক্স ও আয়না পড়েচে, বাবুর প্রকাণ্ড আল্‌বোলা প্রতি টানে শরতের মেঘের মত শব্দ কচ্চে আর মুস্ক ও মুসব্বর মেশান ইরাণী তামাকের খোস্‌বে বাড়ি মাত করেচে। গদির কিছু দূরে একজন খোট্টা সিদ্ধির মাজুম, হজ্‌মী-গুলি ও পালংতোড় প্রভৃতি 'কুয়ৎ কি চিজ্' রুমালে বেঁধে বসে আছেন। তিনি লখ্‌নৌয়ের একজন সম্পন্ন জহুরী পুত্র, এক্ষণে শহরেই বাস, হয়তো বছর কতক হল আফিমের তেজিমন্দি খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে বাবুর অবশ্যপোষ্য হয়েছেন। মনে করুন, তাঁর অনেক প্রকার হাকিমী ঔষধ জানা আছে, সিদ্ধি সম্পর্কীয় মাজুমও উত্তম রকম প্রস্তুত কত্তে পারেন; বিশেষতঃ বিস্তর বাই, কথক ও গানেওয়ালীর সহিত পরিচয় থাকায় আপন হেকমত ও হুনুরিতে আজকাল বাবুর দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠেচেন। এঁর পাশে ভবানীবাবু ও মিস্টুয়ার্স আর্টফুল ডজর্‌স্ উকিল সাহেবদের হেড কেরানী হলধরবাবু। ভবানীবাবু ঐ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত লোক, আদালতে ভারী মাইনের চাকরি করেন, এ সওয়ায় অন্তঃশীলে কোম্পানির কাগজের দালালি, বড় বড় রাজা

রাজড়ার আমমোক্তারি ও মোকদ্দমার ম্যানেজারি করা আছে। এমন কি, অনেকেই স্বীকার করে থাকেন যে, ভবানীবাবু ধড়িবাজিতে উমেশ হতে সরেস ও বিষয়কর্মে জয়কৃষ্ণ হতেও জবর! ভবানীবাবুর পার্শ্বস্থ হলধরও কম নন্—মনে করুন, হলধর উকিলের বাড়ির মকদ্দমার তদ্বিরে, ফের ফন্দীতে ও জাল জালিয়াতে প্রকৃত শুভংকর। হলধরের মোচা গোঁপ, মুসকের মত ভুঁড়ি, হাতে ইষ্টিকবচ, কোমরে গোট ও মাদুলি, সরু ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি পরিধান, তার ভিতরে একটা কাচ, কপালে টাকার মত একটা রক্তচন্দনের টিপ ও দাঁতে মিসি—চাদরটা তাল পাকিয়ে কাঁদে ফেলে অনবরত তামাক খাচ্চেন ও গোঁপে তা দিয়ে যেন বুদ্ধি পাকাচ্চেন—এমন সময় বাবুর মজলিসে কলহরিবাবু ও রামভদ্দরবাবু উপস্থিত হলেন, কলহরি ও রামভদ্দরকে দেখে বাবু সাদর সম্ভাষণে বসালেন, হুঁকাবরদার তামাক দিয়ে গেল, বাবুরা শ্রান্তি দূর করে তামাক খেতে খেতে এ কথা সে কথার পর বলেন, 'মশাই আজ রামলীলার বড় ধুম! আজ শুনলেম লক্ষ্মণের শক্তিশেল হবে, বিস্তর বাজি পুড়বে, এখানে আস্‌বার সময় দেখ্‌লেম ওপাড়ার রামবাবুর চৌঘুড়ি গেল। শম্ভুবাবু বগিতে লক্ষ্মীকে নিয়ে যাচ্চেন—আজ বেজায় ভিড়। মশাই যাবেন না?' তখনি ভবানীবাবু এই প্রস্তাবের পোষকতা কল্লেন—বাবুও রাজী হলেন—অমনি 'ওরে! ওরে! কোন্ হ্যায় রে। কোন্ হ্যায়!' শব্দ পড়ে গেল; আশে পাশে 'খোদাবন্দ' ও 'আজ্ঞা যাইয়ে'র প্রতিধ্বনি হতে লাগ্‌লো—হরকরাকে হুকুম হল, বড় ব্রিজকা ও বিলাতী জুড়ি তৈরি কত্তে বল। শিগ্‌গির।

ঠাওরান, যেন এদিকে বাবুর ব্রিজকা প্রস্তুত হতে লাগ্‌লো, পেয়ারের আরদালীরা পাগড়ি ও তক্‌মা পরে আয়নায় মুখ দেখচে। বাবু ড্রেসিংরুমে ঢুকে পোশাক পচ্চেন। চার-পাঁচজন চাকরে পড়ে চাল্লিশ রকম প্যাটার্নের ট্যাস্‌ল্ দেওয়া টুপি ও সাটিনের চাপকান পায়জামা বাছুনি কচ্চে! কোন্‌টা পল্লে বড় ভালো দেখাবে বাবু মনে মনে এই ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হচ্চেন, হয়তো একটা জামা পরে আবার খুলে ফেললেন। একটা টুপি মাথায় দিয়ে আয়নায় মুখ দেখে মনে ধচ্চে না; আবার আর একটা মাথায় দেওয়া হচ্চে, সেটাও বড় ভালো মানাচ্চে না, এই অবকাশে একজন মোসাহেবকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, 'কেমন হে? এটা কি মাথায় দেবো!' মোসাহেব সব দিক্ বজায় রেখে, 'আজ্ঞা পোশাক পরলে আপনাকে যেমন খোলে, শহরের কোন শালাকে

এমন খোলে না' বল্‌চেন। বাবু এই অবসরে আর একটা টুপি মাথায় দিয়ে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, 'এটা কেমন ?' মোসাহেব 'আজ্ঞে এমন আর কারো

নাই' বলে বাবুর গৌবব বাড়াচ্চেন ও মধ্যে মধ্যে 'আপ্‌ রুচি খানা ও পর রুচি পিন্না' বয়েৎটা নজির কচ্চেন। এই প্রকার অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বিবেচনার পর হয়তো একটা বেয়াড়া রকমের পোশাক পরে, শেষে পোমেটম, ল্যাভেণ্ডার ও আতর মেখে আংটি চেন ও ইস্টিক বেছে নিয়ে দু-ঘণ্টার পর বাবু ড্রেসিংরুম হতে বৈঠকখানায় বার দিলেন। হলধর, ভবানী, রামভদ্দর প্রভৃতি বৈঠকখানাস্থ সকলেই আপনাদের কর্তব্য কর্ম বলেই যেন 'আজ্ঞে পোশাকে আপনাকে বড় খুলেচে' বলে নানাপ্রকার প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লেন ; কেউ বললেন, 'হুজুর, এ কি গিব্‌সনের বাড়ির তৈরি ?' কেউ ঘড়ির চেন, কেউ আংটি ও ইস্টিকের অনিয়ত প্রশংসা কত্তে আরম্ভ কল্লেন।

মোসাহেবদের মধ্যে যাঁদের কাপড়চোপড়গুলি, বাবুর ব্রিজকা ও বিলাতী জুড়ির যোগ্য নয়, তাঁরা বাবুর প্রসাদী কাপড়চোপড় পরে, কানে আতরের তুলো গুঁজে চেহারা খুলে নিলেন, প্রসাদী পোশাক পরে মোসাহেবদের আর আহ্লাদের সীমা রইলো না। মনে হতে লাগ্‌লো, 'বাড়ির কাছের উঠ্‌নোওয়ালা মুদি মাগী ও চেনা লোকেরা যেন দেখতে পায়, আমি কেমন পোশাকে হুজুরের সঙ্গে যাচ্চি'; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক মোসাহেব সর্বদাই আক্ষেপ করে থাকেন যে, তাঁরা যখন বাবুদের

সঙ্গে বড় বড় গাড়ি ও ভালো কাপড়চোপড় পরে বেরোন তখন কেউ তাঁদের দেখতে পায় না, আর গামছা কাঁধে করে বাজার কত্তে বেরুলেই সকলের নজরে পড়েন।

এদিকে টুং টাং টুং টাং করে মেকাবী ক্লাকে পাঁচটা বাজলো, 'হুজুর গাড়ি হাজির' বলে হরকরা হুজুরে প্রোক্লেম কল্লে, বাবু মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠ্‌লেন—বিলাতী জুড়ি কোচম্যানের ইঙ্গিতে টপাটপ্‌ টপাটপ্‌ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে চাকরেরা 'রাম বাঁচলুম' বলে কেউ বাবুর মছলন্দে গড়িয়ে পড়লো, কেউ হুজুরের সোনাবাঁধানো হুঁকোটা টেনে দেখতে লাগ্‌লো—অনেকে বাবুর ব্যবহারের কাপড়চোপড় পরে বেড়াতে বেরুলো। শহরের অনেক বড়মানুষের বাড়ি বাবুদের সাক্ষাতে বড় আঁটাআঁটি থাকে, কিন্তু তাঁদের অসাক্ষাতে বাড়ির অনেক ভাগ উদোম্ এলো হয়ে পড়ে!

ক্রমে বাবুর ব্রিজকা চিৎপুর রোডে এসে পড়লো। চিৎপুর রোডে আজ গাড়ি ঘোড়ার অসম্ভব ভিড় মারোয়াড়ী, খোট্টা ও বেশ্যারা খাতায় খাতায় ছক্কর ও কেরাঞ্চীতে রাম-

লীলা দেখতে চলেচে; যাঁরা যোত্রহীন, তাঁরাও শখের অনুরোধ এড়াতে না পেরে হেঁটে চলেছেন—কল্‌কেতা শহরের এই একটি আজব গুণ যে মজুর হতে লক্ষপতি পর্যন্ত সকলেরই মনে সমান শখ। বড়লোকরা দানসাগরে যাহা নির্বাহ করবেন, সামান্য লোককে ভিক্ষা বা চুরি পর্যন্ত স্বীকার করেও কায়ক্লেশে তিলকাঞ্চনে সেটির নকল কত্তে হবে।

আন্দাজ করুন, যেন এদিকে ছক্কর ও বড় বড় গাড়ির গতিতে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে শহর অন্ধকার করে তুললে। সূর্যদেবও সমস্ত দিন কমলিনীর সহবাসে কাটিয়ে সুরতপরিশ্রান্ত নাগরের মত ক্লান্ত হয়ে ক্লান্তি দূর করবার জন্যেই যেন অস্তাচল আশ্রয় কল্লেন; প্রিয় সখী প্রদোষের পিছে অভিসারিণী সন্ধ্যাবধূ ধীরে ধীরে সঙ্গিনী শর্বরীর অনুসরণে নির্গতা হলেন; রহস্যজ্ঞ অন্ধকার সমস্ত দিন নিভৃতে লুকিয়েছিল, এখন পাখিদের সংকেতবাক্যে অবসর বুঝে ক্রমশ দিক্‌সকল আচ্ছাদিত করে নিশানাথের নিমিত্ত অপূর্ব বিহারস্থল প্রস্তুত কত্তে

আরম্ভ কল্লে। এদিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা রামলীলার রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হল। রামলীলার রঙ্গভূমি, রাজা বাহাদুরের পুর্বে বাগানখানি শহরের প্রধান ছিল, কিন্তু কুলপ্রদীপ কুমারদের কল্যাণে আজকাল প্রকৃত চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেচে। পুর্বে রামলীলা ঐ রাজা বদ্দিনাথ বাহাদুরের বাগানেই হত, গত বৎসর হতে রহিত হয়ে রাজা নরসিংহ বাহাদুরের বাগানে আরম্ভ হয়েচে। নরসিংহ বাহাদুরের ফুলগাছের উপর যারপরনাই শখ ছিল এবং চিরকাল এই ফুলগাছের উপাসনা করেই কাটিয়ে গ্যাচেন, সুতরাং তাঁর বাগান শহরের শ্রেষ্ঠ হবে বড় বিচিত্র নয়। এমন কি অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, গাছের পারিপাট্যে রাজা বাহাদুরের বাগান কোম্পানির বাগান হতে বড় খাটো ছিল না। কিন্তু বর্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেললেন; বড় বড় গাছগুলি উপড়ে বিক্রি করা হল, রাজা বাহাদুরের পুরাতন জুতো পর্যন্ত পড়ে রইলো না, যে প্রকারে হোক টাকা উপার্জন করাই কুমার বাহাদুরের মতে কর্তব্য কর্ম। সুতরাং শেষে এই শ্রেষ্ঠ বাগান রামলীলার রঙ্গভূমি হয়ে উঠ্‌লো, ঘরে বাইরে বানর নাচতে লাগলো, শহরে সোরোত উঠ্‌লো, এবার বদ্দিনাথের বদলে রাজা নরসিংহের বাগানে 'রাললীলা' কিন্তু এবার গাড়ি ঘোড়ার টিকিট। রাজা বদ্দিনাথের বাগানে রামলীলার সময় টিকিট বিক্রি করা পদ্ধতি ছিল না, রাজা বাহাদুর ও অপর বড়মানুষে বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কত্তেন তাতেই সমুদায় খরচ কুলিয়ে উঠতো। কিন্তু রাজা বদ্দিনাথ বৃদ্ধবস্থায় দু-তিন বৎসর হল দেহত্যাগ করায় রাজকুমার সুবুদ্ধি বাহাদুরেরা বাগানখানি ভোগ করে নিলেন, মধ্যে দেইজি পাঁচিল পড়লো, সুতরাং অন্য বড়মানুষেরাও রামলীলায় তাদৃশ উৎসাহ দেখালেন না, তাতেই এবার টিকিট করে কতক টাকা তোলা হয়। বল্‌তে কি, কলিকাতা বড় চমৎকার শহর। অনেকেই রং তামাসায় অপব্যয় কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর, টিকিট সত্বেও রামলীলার বাগান গাড়ি ঘোড়ায় ও জনতায় পরিপুর্ণ, লোকের বেজায় ভিড়।

এদিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা জনতার জন্যে অধিক দূর যেতে পাল্লে না, সুতরাং হজুর দলবল সমেত পায়দলে বেড়ানোই সঙ্গত ঠাউরে গাড়ি হতে নেবে বেড়াতে বেড়াতে রঙ্গভূমির শোভা দেখতে লাগলেন।

রঙ্গভূমির গেট হতে রামলীলার রণক্ষেত্র পর্যন্ত দু-সারি দোকান বসেচে, মধ্যে মধ্যে নাগরদোলা ঘুচ্চে—গোলাবী খিলি, খেলনা, চনেচুর ও চীনের বাদাম

প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের চিৎকার উঠেচে। ইয়ারের দল খাতায় খাতায় প্যারেড করে বেড়াচ্চে, রাঁড়, খোট্টা, বাজে লোক ও বেনের দলই বারো আনা। রণক্ষেত্রের চার দিকে বেড়ার ধারে চার-পাঁচ থাক্ গাড়ির সার, কোন গাড়ির উপর একজন সৌখীন ইয়ার দু-চার দোস্ত ও দুই একটি মেয়েমানুষ নিয়ে মজা কচ্চেন। কোনখানির ভেতরে চীনে কোট ও চুলের চেনওয়ালা চারজন ইয়ার্ ও একটি মেয়েমানুষ, কোনখানিতে গুটিকত পিল ইয়ার টেক্কা জ্যাঠা ছেলে ইস্কুলের বই বেচে পয়সা সংগ্রহ করে গোলাবী খিলি ও চরসে মজা লুটচে। কতগুলি গাড়ি নিছক খোট্টা মারোয়াড়ী ও মেড়ুয়াবাদী, কতকগুলি খোসপোশাকী বাবুতে পুর্ণ।

আমাদের হুজুর এই সকল দেখতে দেখতে থন্নুমলবাবুর হাত ধরে ক্রমে রণক্ষেত্রের দরজায় এসে পৌছলেন—সেথায় বেজায় ভিড়! দশ-বারোজন চৌকিদার অনবরত সপাসপ করে বেত মাচ্চে; দুজন সার্জন সবলে ঠেলে রয়েচে তথাপি রাখতে পাচ্চে না, থেকে থেকে 'রাজা রামচন্দ্রজীকা জয়!' বলে খোট্টারা ও রণক্ষেত্রের মধ্য হতে বানরেরা চেঁচিয়ে উঠচে, সকলেরি ইচ্ছা, রামচন্দ্রের মনোহর রূপ দেখে চরিতার্থ হবে, কিন্তু কার সাধ্য সহজে রামচন্দ্রের সমীপস্থ হয়।

হুজুর অনেক কষ্টেস্হষ্টে বেড়ার দ্বার পার হয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে বানরের দলে মিশলেন। রণক্ষেত্রের অন্য দিকে লঙ্কা! মনে করুন সেথায় সাজা রাক্ষসেরা ঘুরে বেড়াচ্চে ও বেড়ার নিকটস্থ মালভরা গাড়ির দিকে মুখ নেড়ে হিঁ হিঁ করে ভয় দেখাচ্চে। সাজা বানরেরা লাফাচ্চে ও গাছ পাথরের বদলে ছেঁড়া কুঁপো ও পাঁকাটি নিয়ে ছোঁড়াছুড়ি কচ্চে—

বাবু এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপার দেখে যারপরনাই পরিতুষ্ট হয়ে বেড়ার পাশে

পাশে হাঁ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, আরো দু-চারজন বেনে বড়মানুষ ও ব্যাদ্‌ড়া বনেদী বাবুরা ভিতরে এসে বাবুর সঙ্গে জুটে গেলেন, মধ্যে মধ্যে দালাল ও তুলোওয়ালারা ইন্‌ফ্লুয়েনশল রিফরম্‌ড খোট্টার দলের সঙ্গেও বাবুর সেখানে সাক্ষাৎ হতে লাগলো, কেউ 'রাম রাম' কেউ 'আদাব' কেউ 'বন্দীগি' প্রভৃতি সেলামাল্কির সঙ্গে পানের দোনা উপহার দিয়ে বাবুর অভ্যর্থনা কত্তে লাগলো; এঁরা অনেকে দুই প্রহরের সময় এসেচেন, রাত্তির দশটার পর ভরপেট রামলীলে গিলে বাড়ি ফিরবেন।

রণক্ষেত্রের মধ্যে বাবু ও দু-চার সবস্‌ক্রাইবর বড়মানুষের ছেলেদের বেড়াতে দেখে ম্যানেজার বা তাঁর আসিস্ট্যাণ্ট দৌড়ে নিকটস্থ হয়ে পানের দোনা উপহার দিয়ে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থ দু-চার কাগজের সঙের তরজমা করে বোঝাতে লাগলেন; কত গাড়ি ও আন্দাজ কত লোক এসেচে, তার একটা মনগড়া মিমো দিলেন ও প্রত্যেক বানর, ভাল্লুক ও রাক্ষসের সাজগোজের প্রশংসা কত্তেও বিস্মৃত হলেন না। বাবু ও অন্যান্য সকলে 'এ দফে বড়ি আচ্ছা হুয়া, আর বরস্ এসা নেহি হুয়া থা' প্রভৃতি কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়ে ম্যানেজরদের অপ্যায়িত কত্তে লাগলেন। এদিকে বাজিতে আগুন দেওয়া আরম্ভ হল। ক্রমে চার-পাঁচ রকম বাজে কেতার বাজি পুড়ে সে দিন রামলীলা বরখাস্ত হল। রাম লক্ষ্মণকে আরতি করে ও ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করে বাজে লোকেরা জন্ম সফল বিবেচনা করে ঘরমুখো হল। কেরাঞ্চীর ঘোড়ারা বাতকর্ম কত্তে কত্তে বহু কষ্টে গাড়ি নিয়ে প্রস্থান কল্লে। বাবু সেই ভিড়ের ভিতর হতে অতিকষ্টে গাড়ি চিনে নিয়ে সওয়ার হলেন—সে দিনের রামলীলার এই রকমে উপসংহার হল।

আমাদের এ সকল বিষয়ে বড় শখ, সুতরাং আমরাও একখানি ছ্যাকড়া গাড়ির পিছনে বসে রামলীলা দেখতে যাচ্ছিলেম, গাড়িখানির ভিতরে একজন ছুতোর বাবু, গুটি দুই গেরস্থারী রাঁড় ও তাঁর চার-পাঁচজন দোস্ত ছিল, খানিক দূর যেতে না যেতেই একটা জন্মজ্যেঠা ফচকে ছোঁড়া রাস্তা থেকে 'গাড়োয়ান পিছুভারি' 'গাড়োয়ান পিছুভারি' বলে চেঁচিয়ে ওঠায় গাড়োয়ান 'কে রে শালা' বলে সপাৎ করে এক চাবুক ঝাড়লে। ভেতর থেকে 'আরে কে রে, ল্যে বে যা, ল্যে বে যা' চিৎকার হতে লাগলো—অগত্যা সে দিন আর যাওয়া হল না, মনের সখ মনেই রইলো!

শরতের শশধর স্বচ্ছ শ্যাম গগনমাঝে নক্ষত্রসমাজে বিরাজ কচ্চেন দেখে

প্রণয়িনী রজনী মানভরে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে রয়েচেন। চক্রবাকদম্পতি কত প্রকার সাধ্যসাধনা কচ্চে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্চে না, স্বপত্নীর দুর্দশা দর্শন করে স্বচ্ছ সলিলে কুমুদিনী হাসতেছে, চাঁদের চির অনুগত চকোর-চকোরী শর্বরীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাঁরে তুড়ে ভৎর্সনা কচ্চে, ঝিঁঝিপোকা ও উইচিংড়ারাও চিৎকার করে চকোর-চকোরীর সঙ্গে যোগ দিতেছে, লম্পটশিরোমণির ব্যবহার দেখে প্রকৃতি সতী বিস্মিত হয়ে রয়েচেন, এ সময়ে নিকটস্থ হলে রজনীরঞ্জন বড় অপ্রস্তুত হবেন বলেই যেন পবন বড় বড় গাছপালায় ও ঝোপে ঝাপের আশে পাশে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলেচেন। অভিমানিনী মানবতী রজনীর বিন্দু বিন্দু নয়নজল শিশিরচ্ছলে বনরাজি ও ফুলদামে অভিষিক্ত কচ্চে।

এদিকে বাবুর ব্রিজকা ও বিলাতী জুড়ি টপাটপ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে ভদ্রাসনে পৌঁছল। বাবু ড্রেসিংরুমে কাপড় ছাড়তে গেলেন, সহচরেরা বৈঠকখানায় বসে তামাক খেতে খেতে রামলীলার জাওর কাটতে লাগলেন এবং সকলে মিলে প্রাণ খুলে দু-চার অপর বড়মানুষের নিন্দাবাদ জুড়ে দিলেন। বাবুও কিছু পরে কাপড়চোপড় ছেড়ে মজলিসে বার দিলেন, গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গেল।

বোধ হয় মহিমার্ণব পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, বাবু রামভদ্দর হুজুরের সঙ্গে রামলীলা দেখতে গিয়েছিলেন, বর্তমানে দু-চার বাজে কথার পর বাবু, রামভদ্দরবাবুকে দু-একটা টপ্পা গাইতে অনুরোধ কল্লেন, রামভদ্দর-বাবুর গাওনা বাজনায় বিলক্ষণ শখ, গলাখানিও বড় চমৎকার, যদিও তিনি এ বিষয়ে পেশাদার নন ; কিন্তু শহরের বড়মানুষ মহলে ঐ গুণেই পরিচিত, বিশেষতঃ বাবু রামভদ্দরের আজকাল সময় ভালো, কোম্পানীর কাগজের দালালিও গাঁতের মাল কেনার দরুন বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার কচ্চেন, বাড়িতে নিত্যনৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসবও ফাঁক যায় না। বাপ-মার শ্রাদ্ধ ও ছেলে মেয়ের বিয়ের সময়ে দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলা আছে। গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণেরা প্রায় বাবুর দলস্থ। কায়স্থ ও নবশাকও অনেকগুলি বাবুর অনুগত। কর্মকাজের ভিড়ের দরুন ভদ্দরবাবুর বারো মাস প্রায় শহরেই বাস, কেবল মধ্যে পালপার্বণ ও ছুটিটা আস্‌টায় বাড়ি যাওয়া আছে। ভদ্দরবাবুর শহরের বাদুড়বাগানের বাসাতেও অনেকগুলি ভদ্দর লোকের ছেলেকে অন্ন দেওয়া আছে ও দু-চারজন বড়মানুষেও ভদ্দরবাবুরে বিলক্ষণ স্নেহ করে থাকেন।

রামভদ্দরবাবু সিমলের রায়বাহাদুরের সোনার কাটি রূপোর কাটি ছিলেন ও অন্যান্য অনেক বড়মানুষেই এঁরে যথেষ্ট স্নেহ করে থাকেন, সুতরাং বাবু অনুরোধ করামাত্র ভদ্দরবাবু তানপুরা মিলিয়ে একটি নিজ রচিত গান জুড়ে দিলেন, হলধর তবলা বাঁয়া ঠুকে নিয়ে বোলওয়াট ও ফ্যালওয়াটের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ কল্লেন। রামলীলার নক্‌শা এইখানেই ফুরালো।

রেলওয়ে

দুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া হতে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলওয়ে খুলেচে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাল কালো অক্ষরে ছাপানো ইংরেজি বাংলায় এস্তেহার মারা গ্যাচে; অনেকেই আমোদ করে বেড়াতে যাচ্চেন—তীর্থযাত্রীও বিস্তর। শ্রীপাঠ নিমতলার প্রেমানন্দ দাস বাবাজীও এই অবকাশে বারাণসী দর্শন কত্তে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বাবাজী শ্রীপাঠ জোড়াসাঁকোর প্রধান মঠের একজন কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে, বাবাজীর অনেক শিষ্য সামন্ত ও বিষয়আশয় প্রচুর ছিল। বাবাজীর শরীর স্থূল, ভুঁড়িটি বড় তাকিয়ার মত প্রকাণ্ড, হাত-পাগুলিও তদনুরূপ মাংসল ও মেদময়। বাবাজীর বর্ণ কষ্টিপাথরের মত, হুঁকোর খোলের মত ও ধানসিদ্ধ হাঁড়ির মত কুচকুচে কালো। মস্তক কেশহীন করে কামানো, মধ্যস্থলে লম্বাচুলের চৈতনচুট্‌কি সর্বদা খোঁপার মত বাঁধা থাকতো; বাবাজী বহুকাল কচ্ছ দিয়ে কাপড় পরা পরিহার করেছিলেন, সুতরাং কৌপিনের উপর নানা রঙের বহির্বাস ব্যবহার কত্তেন। সর্বদা সর্বাঙ্গে গোপীমৃত্তিকা মাখা ছিল ও গলায় পদ্মবীচি তুলসী প্রভৃতি নানা প্রকার মালা সর্বদা পরে থাকতেন, তাতে একটি লাল বনাতের বড় বালিশের মত জপমালার থলি পিতলের কড়ায় আবদ্ধ ঝুল্‌তো।

বাবাজী একটি ভালো দিন স্থির করে প্রত্যুষেই দৈনন্দিন কার্য সমাপন কল্লেন ও তাড়াতাড়ি যথাকথঞ্চিৎ বাড়ির বিগ্রহের প্রসাদ পেয়ে দুই শিষ্য ও তল্পিদার ও ছড়িদার সঙ্গে লয়ে মঠ হতে বেরিয়ে গাড়ির সন্ধানে চিৎপুর রোডে উপস্থিত হলেন। পাঠকবর্গ মনে করুন, যেন স্কুল ও আপিস খোলবার এখনো বিলম্ব আছে, রামলীলার মেলার এখনো উপসংহার হয়নি, সুতরাং রাস্তায় গহনার কেরাঞ্চী থাকবার সম্ভাবনা কি, বাবাজী অনেক অনুসন্ধান করে

শেষে এক গাড়ির আড্ডায় প্রবেশ করে অনেক কষামাজার পর একজনকে ভাড়া যেতে সম্মত কল্লেন। এদিকে গাড়ি প্রস্তুত হতে লাগ্‌লো, বাবাজী তারি অপেক্ষায় এক বেশ্যালয়ের বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রীপাঠ কুমার-নগরের জ্ঞানানন্দ বাবাজী প্রেমানন্দ বাবাজীর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনিও বেল-

গাড়িতে চড়ে বারাণসী দর্শনে ইচ্ছুক হয়ে কিছু পূর্বেই বাবাজীর শ্রীপাঠে উপস্থিত হয়ে সেবাদাসীর কাছে শুনলেন যে বাবাজীও সেই মানসে কিছু পূর্বেই বেরিয়ে গ্যাচেন, সুতরাং এঁরই অনুসন্ধান কত্তে সেইখানেই উভয়ের সাক্ষাৎ হল। জ্ঞানানন্দ বাবাজী যারপরনাই কৃশ ছিলেন, দশ বৎসর জ্বর ও কাশি রোগ ভোগ করে শরীর শুকিয়ে কঞ্চি ও কাঠের মত পাকিয়ে গেছিল, চক্ষু দুটি কোটরে বসে গ্যাচে, মাংস মেদের লেশমাত্র শরীরে নাই, কেবল ক-খান কঙ্কালমাত্রে ঠেকেছে , তায় এক মাথা রুক্ষ তৈলহীন চুল, একখানা মোটা লুই দু-পাঠ করে গায়ে জড়ানো, হাতে একগাছা বেঁউড় বাঁশের বাঁকা লাঠি ও পায়ে একজোড়া জগন্নাথী উড়ে জুতো। অনবরত কাশ্‌চেন ও গয়ার ফেলচেন এবং মধ্যে মধ্যে শামুক হতে এক এক টিপ নস্য লওয়া হচ্চে। অনবরত নস্য নিয়ে নাকের নলি এমনি অসাড় হয়ে গ্যাচে যে, নাক দিয়ে অনবরত নস্য ও সর্দিমিশ্রিত কফজল গড়াচ্চে, কিন্তু তিনি তা টেরও পাচ্চেন না, এমন কি, এর দরুন তাঁরে ক্রমে খোনা হয়ে পড়তে হয়েছিল এবং আলজিবও খারাপ হয়ে যাওয়ায় সর্বদাই ভেট্‌কী মাছের মত হাঁ করে থাকতেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দের সাক্ষাৎ পেয়ে বড়ই আহ্লাদিত হলেন।
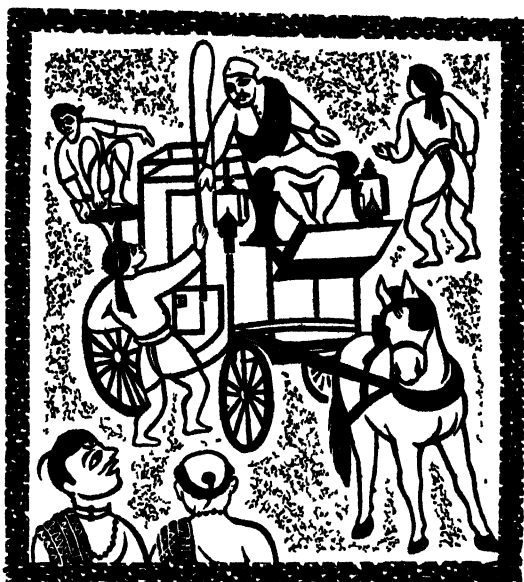
প্রথমে পরস্পরে কোলাকুলি হল, শেষে কুশল প্রশ্নাদির পর দুই বন্ধুতে দুই ভেয়ের মত একত্রে বারাণসী দর্শন কত্তে যাওয়াই স্থির কল্লেন।

এদিকে কেরাঞ্চী প্রস্তুত হয়ে বাবাজীদের নিকটস্থ হল, তল্পিদার তল্পি নিয়ে ছাতে, ছড়িদার ও সেবাৎ পেছনে ও দুই শিষ্য কোচবক্সে উঠলো। বাবাজীরা দুজনে গাড়ির মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। প্রেমানন্দ গাড়িতে পদার্পণ করবা মাত্র গাড়িখানি মড়্ মড়্ উঠ্লো, সামনে দিকে জ্ঞানানন্দ বসে পড়লেন। উপরের বারান্দায় কতকগুলি বেশ্যা দাঁড়িয়েছিল, তারা বাবাজীকে দেখে পরস্পর 'ভাই! একটা একগাড়ি গোঁসাই দেখেছিস্! মিন্‌সে যেন কুম্ভকর্ণ' প্রভৃতি বলাবলি কত্তে লাগলো। গাড়োয়ান গাড়িতে উঠে সপাসপ্ করে চাবুক দিয়ে ঘোড়ার রাস হ্যাঁচকাতে হ্যাঁচকাতে জিবে ট্যাক্ ট্যাক্ শব্দ করে চাবুক মাথার পরে ঘোরাতে লাগ্লো কিন্তু ঘোড়ার সাধ্য কি যে এক পা নড়ে; কেবল অনবরত লাথি ছুঁড়তে লাগ্ল ও মধ্যে মধ্যে বাতকর্ম করে আসর জমকিয়ে দিলে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, আমরা পূর্বেই বলে গেছি, কলিকাতা আজব শহর! ক্রমে রাস্তায় লোক জমে গেল! এই ভিড়ের মধ্যে একটা চীনের বাদামওয়ালা ফচ্‌কে ছোঁড়া বলে উঠলো, 'ওরে গাড়োয়ান! এক দিকে একটা ধূম্রলোচন ও আর এক দিকে একটা চিম্‌ড়ে সওয়ারী, আগে পাষাণ ভেঙে নে, তবে গাড়ি চল্‌বে।' অমনি উপর থেকে বেশ্যারা বলে উঠলো, 'ওরে এই রোগা মিন্‌সেটার গলায় গোটাকতক পাথর বেঁধে দে, তা হলে পাষাণ ভাঙা হবে।' প্রেমানন্দ এই সকল কথাতে বিরক্ত হয়ে ঘৃণা ও ক্রোধে জ্বলে উঠে খানিকক্ষণ ঘাড় গুঁজে রইলেন, শেষে ঈষৎ ঘাড় উঁচু করে জ্ঞানানন্দকে বললেন, 'ভায়া! শহরের স্ত্রীলোকগুলা কি ব্যাপিকা দেখচো!' ও শেষে 'প্রভো তোমার ইচ্ছা' বলে হাই তুললেন। জ্ঞানানন্দও হাই তুললেন ও দু-বার তুড়ি দিয়ে এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন, 'ঠিঁক বঁলেঁচোঁ দাঁদাঁ, ওঁরাঁ ভত্তাঁর কাছে উপদেঁশ পাঁঞি নাঁঞি, ওঁঞাদের রাঁমা রঁঞ্জিকার পাঁঠ দেওঞা উচিত।' প্রেমানন্দ রামারঞ্জিকার নাম শুনে বড়ই পুলকিত হয়ে বললেন, 'ভায়া না হলে আর মনের কথা কে বলে, রামারঞ্জিকার মত পুঁথি ত্রিজগতের নাই। প্রভো তোমার ইচ্ছা!' জ্ঞানানন্দ এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এক টিপ নস্য দিয়ে অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে মাথাটা চুল্‌কে বললেন, 'দাঁদাঁ শুনেচি বিবিঁরা নাঁকি রাঁমারঁঞ্জিকা পড়ছেঁ।' প্রেমানন্দ অমনি আহ্লাদে 'আরে ভায়া, রামারঞ্জিকা

পুঁথির মত ত্রিজগতে হ্যান পুঁথি নাঞি ! প্রভো তোমার ইচ্ছা !'

এদিকে অনেক কস্‌লাতের পর কেরাঞ্চী গুড়ি গুড়ি চলতে লাগলো, তল্পিদারেরা গাড়ির ছাতে বসে গাঁজা টিপ্‌তে লাগলো, মধ্যে শরতের মেঘে এক পশলা ভারী বৃষ্টি আরম্ভ হল, বাবাজীরা গাড়ির দরজা ঠেলে দিয়ে অন্ধকারে বারোইয়ারির গুদোম্‌জাত সংগুলির মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। খানিকক্ষণ এইরূপ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে জ্ঞানানন্দ বাবাজী একবার গাড়ির ফাটলে চক্ষু দিয়ে বৃষ্টি কিরূপ পড়চে তা দেখে নিয়ে এক টিপ নস্য নিলেন ও বার দুই কেশে বললেন, "দাঁদা অ্যাকটা সংকীর্তন হঁক, শুঁধু শুঁধু বসে কাঁল না হরছে এন্না।" প্রেমানন্দ সঙ্গীতবিদ্যার বড় প্রিয় ছিলেন, নিজে ভালো গাইতে পারুন আর নাই পারুন, আড়ালে ও নির্জনে সর্বদা গলাবাজি কত্তেন ও দিবারাত্র গুন্‌গুনোনির কামাই ছিল না। এ ছাড়া বাবাজী সঙ্গীতবিষয়ক একখানা বইও ছাপিয়েছিলেন এবং ঐ সকল গান প্রথম প্রথম দু-এক গোঁড়ার বাড়ি মজলিস করে গায়ক দিয়ে গাওয়ানো হয়, সুতরাং জ্ঞানানন্দের কথাতে বড়ই প্রফুল্লিত হয়ে মল্লার ভেঁজে গান ধল্লেন—পাঠশালের ছেলেরা যেমন ঘোষাবার সময় সদ্দার পোড়োর সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়ে গণ্ডায় এ্যাণ্ডা বলে সায় দিয়ে যায়, সেই প্রকার জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দের সঙ্গীত শুনে উৎসাহান্বিত হয়ে মধ্যে মধ্যে দুই একটা তান মারতে লাগলেন। ভাঙা ও খোনা আওয়াজের একত্র চিৎকারে গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেললে, তল্পিদার তড়াক করে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে গাড়ির দরজা খুলে দ্যাখে যে বাবাজীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে গান ধরেচেন ! রাস্তার ধারে পাহারাওয়ালারা তামাক খেতে খেতে ঢুলতেছিল, গাড়ির ভেতরের বেতরো বেয়াড়া আওয়াজে চম্‌কে উঠে কল্‌কে ফেলে দৌড়ে গাড়ির কাছে উপস্থিত হল। দোকানদারেরা দোকান থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগ্‌লো, কিন্তু বাবাজীরা প্রভুপ্রেমগানে এমনি মেতে গিয়েছিলেন যে, তখনো তান মারা থামেনি। শেষে সহসা গাড়ি থামা ও লোকের গোলে চৈতন্য হল ও পাহারাওয়ালাকে দেখে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা নগ্‌দা মুটে ঝাঁকা কাঁদে করে বেকার চলে যাচ্ছিল, এই ব্যাপার দেখে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে 'পুঙ্গির বাই গাড়িমদ্ধি ক্যালাবতী লাগাইয়াচেন' বলে চলে গেল। পাহারাওয়ালাকে কল্‌কে পরিত্যাগ করে আস্‌তে হয়েছিল বলে সেও বাবাজীদের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করে পুনরায় দোকানে গিয়ে বস্‌লো। রেলওয়ে

ব্যাগ হাতে একজন শহুরে নব্য বাবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাড়ির অপেক্ষায় এক দোকানে বসেছিলেন, বৃষ্টিতে তাঁর রেলওয়ে টরমিনাসে উপস্থিত হবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত কত্তেছিল, এক্ষণে বাবাজীদের গাড়োয়ানের সঙ্গে ঐ অবকাশে ভাড়া চুক্তি করে হুড়মুড় করে গাড়ি মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এদিকে গাড়োয়ানও গাড়ি হাঁকিয়ে দিলে। তল্পিদার খানিক দৌড়ে দৌড়ে শেষে গাড়ির পেছনে উঠে পড়লো।

আমাদের নব্য বাবুকে একজন বিখ্যাত লোক বললেও বলা যায়, বিশেষতঃ শহরের সন্নিকটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থলে একটি ব্রাহ্ম সভা স্থাপন করে স্বয়ং তার সম্পাদক হয়েছিলেন, এ সওয়ায় সেই গ্রামেই একটি ভারী মাইনের চাকরি ছিল। নব্য বাবু রিফর্‌মড ক্লাসের টেক্কা ও সমাজের রঙ্গের গোলামস্বরূপ ছিলেন। দিবারাত্র 'সামিগ্রী কত্তেন' ও সর্বদাই ভরপুর থাকতেন—শনিবার ও রবিবার কিছু বেশী মাত্রায় কারগো নিতেন, মধ্যে মধ্যে বানচাল হওয়ারও বাকি থাকতো না। প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজের ফরনিচার ও লাইব্রেরীর বই কিন্‌তে বাবু ছুটি নিয়ে শহরে এসেছিলেন, ক-দিন খোঁড়া ব্রহ্মের সমাজেই প্রকৃতির প্রীতি ও প্রিয়কার্য সাধন করে বিলক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভ করা হয়। মাতাল বাবু গাড়ির মধ্যে ঢুকে প্রথমে প্রেমানন্দ বাবাজীর ভুঁড়ির উপর টলে পড়লেন, আবার ধাক্কা পেয়ে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে

পুনরায় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে টলে পড়লেন। বাবাজীরা উভয়ে তটস্থ হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি কত্তে লাগলেন। মাতাল কোথা বসবেন, তা স্থির কত্তে না পেরে মোছলমানদের গাজীমিয়ার ধ্বজার মত একবার এ পাশ একবার ও পাশ কত্তে লাগলেন।

বাবাজীরা মাতাল বাবুর সঙ্গে এক খাঁচায় পোরা বাজ ও পায়রার মত বাস করুন, ছক্কড়খানি ভরপুর বোঝাইয়ের নবাবী চালে চলুক, তল্পিদাররা অনবরত গাঁজা ফুঁকতে থাক। এদিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় শহর আবার পূর্বানুরূপ গুল্‌জার হয়েছে—মধ্যাবস্থা গৃহস্থরা বাজার কত্তে বেরিয়েচেন, সঙ্গে চাকর ও চাক্‌রানীরা ধামা ও চাঙ্গারি নিয়ে পেছু চলেচে। চিৎপুর রোডে মেঘ কল্লে কাদা হয়, সুতরাং কাদার জন্যে পথিকদের চলবার বড়ই কষ্ট হচ্চে, কেউ পয়নালার উপর দিয়ে, কেউ খানার ধার দিয়ে জুতো হাতে করে কাপড় তুলে চলেচেন। আলু পটল! ঘি চাই! গুড়! ও ঘোল! ফিরিওয়ালারা চিৎকার কত্তে কত্তে যাচ্চে, পাছে মেচুনীরা মাছের চুপড়ি মাথায় নিয়ে হাত নেড়ে হন্‌ হন্‌ করে ছুটেচে, কারু সঙ্গে মেছোর কাঁধে বড় বড় ভেটকী ও মৌলবীর মত চাঁপদাড়ি ও জামাজোড়া পরা চিংড়ি ভরা বাজরা ও ভার। রাজার বাজার, লালা বাবুর বাজার, পোস্তা ও কাপুড়ে পটি জনতায় পরিপূর্ণ। দোকানে বিবিধ সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হচ্চে, দোকানদারেরা ব্যতিব্যস্ত, খদ্দের-দের বেজায় ভিড়! শীতলা ঠাকরুণ নিয়ে ডোমের পণ্ডিত মন্দিরের সঙ্গে গান করে ভিক্ষা কচ্চে, খঞ্জনি ও একতারা নিয়ে বোষ্টুম ও নেড়া-নেড়ীরা গান কচ্চে, 'চার-পাঁচজন তিন দিবস আহার হয় নাই, বিদেশী ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর! দাতালোক' ঘুচ্চেন, অনেকের মৌতাতের সময় উত্তীর্ণ হয়েচে, অন্য কোন উপায় নাই, কিছু উপার্জনও হয় নাই, মদতওয়ালা ধার দেওয়া বন্ধ করেচে, গত কল্য গায়ের চাদরখানিতে চলেচে—আজ আর সম্বলমাত্র নাই। মেথরেরা ময়লা ফেলে এসে মদের দোকানে ঢুকে কষে রম টান্‌চে ও মুদ্দফরাশদের সঙ্গে উভয়ের অবলম্বিত পেশার কোন্‌টা উত্তম, তারি তক্‌রার হচ্চে। শুঁড়ি মধ্যস্থ হয়ে কখনো মুদ্দফরাশের কাজ মেথরের পেশা হতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে মুদ্দফরাশকে সন্তুষ্ট কচ্চেন, কখনো মেথরের পেশা শ্রেষ্ঠ বলে মানচেন। ঢুলি, ডোম, কাওরা ও দুলে বেহারারা কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের ন্যায় উভয় দলের সহায়তা কচ্চে; হয়তো এমন সময় এক দল ঝুমুর বা গদাইনাচ আসরে উপস্থিত হবামাত্র তর্কাগ্নিতে একেবারে জল দেওয়া হল—

মদের দোকান বড়ই সরগরম। শহরের দেবতারা পর্যন্ত রোজগেরে কালী ও পঞ্চানন প্রসাদী পাঁঠার ভাগা দিয়ে বসেচেন, অনেক ভদ্রলোকের বাড়ি উঠ্‌নো বরাদ্দ করা আছে, কোথাও রসুই করা মাংসের সরবরাহ হয়, খদ্দের দলে মাতাল, বেনে ও বেশ্যাই বারো আনা। আজকাল পাঁঠা বড় দুষ্প্রাপ্য ও অগ্নিমূল্য হওয়ায় কোথাও পাঁঠি পর্যন্ত বলি হয়, কোন স্থলে পোষা বিড়াল ও কুকুর পর্যন্ত কেটে মাংসের ভাগায় মিশাল দেওয়া হয়! যে মুখে বাজারের রসুই করা মাংস অক্লেশে চলে যায়, সেথায় বেড়াল, কুকুর ফ্যালবার সামগ্রী নয়। জলচর ও খেচরের মধ্যে নৌকো ও ঘুড়ি ও চতুষ্পদের মধ্যে কেবল খাট খাওয়া নাই।

পাঠকগণ! এতক্ষণ আপনাদের প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের গাড়ি রেলওয়ে টরমিনাসে পৌছুলো প্রায়, দেখুন! আপনাদের বৈঠকখানার ঘড়ি নটা বাজিয়ে দিয়ে পুনরায় অবিশ্রান্ত টুকুটাকু করে চলেচে, আপনারা নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হন, চন্দ্র ও সূর্য অস্তাচলে আরাম করেন, কিন্তু সময় এক পরিমাণে চলচে, ক্ষণকালের তরে অবসর, অবকাশ বা আরামের অপেক্ষা বা প্রার্থনা করে না। কিন্তু হায়! আমরা কখনো কখনো এই অমূল্য সময়ের এমনি অপব্যয় করে থাকি যে, শেষে ভেবে দেখে তার জন্যে যে কত তীব্রতর পরিতাপ সহ্য কত্তে হয়, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

এদিকে ব্রাহ্মবাবু শেষে থপ্‌ করে জ্ঞানানন্দের কোলে বসে পড়লেন, ব্রাহ্মবাবুর চাপনে জ্ঞানানন্দ মৃতপ্রায় হয়ে গুডিশুডি মেরে পেনেলসই হয়ে রইলেন, বাবু সরে সামনে বসে খানিক একদৃষ্টে প্রেমানন্দের পানে চেয়ে ফিক্‌ করে হেসে রেলওয়ে ব্যাগটি পায়দানে নাবিয়ে জ্ঞানানন্দের দিকে একবার কটাক্ষ করে নিয়ে পকেট হতে প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হল লেবেল দেওয়া একটা ফায়েল বার করে শিশির সমুদায় আরকটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে খানিক মুখ বিকৃত করে রুমালে মুখ পুঁচে জেব হাতে দু-ডুমো সুপুরি বার করে চিবুতে লাগলেন। প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ব্রাহ্মবাবুর গাড়িতেই ওঠাতেই বড় বিরক্ত হয়েছিলেন এবং উভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কত্তেছিলেন, কারণ বাবুর একটি কালো বনাতের পেন্‌টুলেন ও চাপ্‌কান পরা ছিল, তার উপর একটা নীল মেরিনোর চায়নাকোট, মাথায় একটা বিভর হেয়ারের চোঙাকাটা ট্যাস্‌ল্‌ লাগানো ক্যাটিকুষ্ট ক্যাপ ও গলায় লাল ও হল্‌দে রঙের জালবোনা কম্‌ফর্টার, হাতে একটি কার্পেটের ব্যাগ ও একটা

বিলিতি ওকের গাঁট বার করা কেঁদো কোঁতকা। এতদ্ভিন্ন বাবুর সঙ্গে একটি ওয়াচ ছিল, তার নিদর্শনস্বরূপ একটি চাবি ও দুটি শিল চুলের গার্ডচেনে ঝুল্‌চে, হাতের আঙুলে একটি আংটিও পরা ছিল। জ্ঞানানন্দ ঠাউরে থাউরে দেখলেন যে, সেটির উপরে 'ওঁ তৎ সৎ' খোদা রয়েচে। ব্রাহ্মবাবু আরকের ঝাঁজ সাম্‌লে প্রেসিডেন্সী ডাক্তারখানার লেবেল-মারা ফায়েলটা গাড়ি হতে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেখলেন, প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ একদৃষ্টে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কচ্চেন, সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে একটু মুচকে হেসে জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'প্রভু! আপনার নাম?' জ্ঞানানন্দ, বাবুকে তাঁর দিকে ফিরে কথা কবার উদ্যম দেখেই শঙ্কিত হয়েছিলেন, এখন প্রথম একবার একটিপ নস্য নিলেন, শামুকটা বার দু-চ্চার ঠুকলেন, শেষে অতিকষ্টে 'আমার নাম পুঁচ করচেনঞ, আমার নাম শ্রীজ্ঞানানন্দ দাঁস দৈব, নিবাঁস শ্রীপাট কুমারনগর।' মাতাল বাবু নাম শুনে পুনরায় একটু মুচ্‌কে হেসে পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'দেব বাবাজীর গমন কোথায় হবে?' জ্ঞানানন্দ এ কথায় কি উত্তর দেবেন, তা স্থির কত্তে না পেরে প্রেমানন্দের মুখ চেয়ে রইলেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক, চোস্ত ও ধড়িবাজ লোক, অনেক স্থলে পোড় খাওয়া হয়েচে, সুতরাং এই অবসরে বল্‌লেন, 'বাবু, আমরা দুইজনেই গোঁসাইগোবিন্দ মানুষ। ইচ্ছা, বারাণসী দর্শন করে বৃন্দাবন যাব। বাবুর নাম?' মাতাল বাবু পুনরায় কিঞ্চিৎ হাসলেন ও পকেট হতে দু-ডুমো সুপুরি মুখে দিয়ে বললেন, 'আমার নাম কৈলাসমোহন, বাড়ি এইখানেই, কর্ম-স্থানে যাওয়া হচ্চে।' প্রেমানন্দ, বাবুর নাম শুনে কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করে বললেন, 'ভালো ভালো, উত্তম!' ব্রাহ্মবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'দেব বাবাজী কি আপনার ভ্রাতা?' এতে প্রেমানন্দ বললেন, 'হাঁ বাপু, এক প্রকার ভ্রাতা বললেও বলা যায়; বিশেষতঃ সহধর্মী, আরো জ্ঞানানন্দ ভায়া বিখ্যাতবংশীয়—পুজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামী ওনার পূর্ব-পিতামহ।' মাতাল বাবু এই কথায় ফিক্ করে হাসলেন ও প্রেমানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, উনি তো জয়দেবের বংশ, প্রভু কার বংশ? বোধ হয় নিতাই চৈতন্যের স্ববংশীয় হবেন?' এই কথায় রহস্য বিবেচনায় প্রেমানন্দ চুপ করে গোঁ হয়ে বসে রইলেন। মনে মনে যে যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন, তা তাঁর মুখ দেখে ব্রাহ্মবাবু জানতে পেরে অপ্রস্তুত হবার পরিবর্তে বরং মনে মনে আহ্লাদিত হয়ে বাবাজীদের যথাসাধ্য বিরক্ত কত্তে কৃতনিশ্চিত হয়ে প্রেমানন্দের দিকে

ফিরে বললেন, 'প্রভু! দিব্যি সেজেচেন। সহসা আপনাদের দেখে আমার মনে হচ্চে, যেন কোথাও যাত্রা হবে, আপনারা সেজে গুজে চলেচেন। প্রভু একটি গান করুন দেখি, মধ্যে আপনাদের তানের ধমকে তো একবার রাস্তায় মহামারী ব্যাপার ঘটে উঠেছিল, দেখা যাক্ আবার কি হয়! শুনেছি প্রভু সাক্ষাৎ তানসেন।' প্রেমানন্দের সঙ্গে বাবুর এই প্রকার যত কথাবার্ত্তা হচ্চে, জ্ঞানানন্দ ততই ভয় পাচ্ছেন ও মধ্যে মধ্যে গাড়ির পার্শ্ব দিয়ে দেখচেন রেলওয়ে টরমিনাস কত দূর, শীঘ্র পৌছুলে উভয়ের এই ভয়ানক বেল্লিকের হাত হতে পরিত্রাণ হয়।

এদিকে ব্রাহ্মবাবুর কথায় প্রেমানন্দও বড়ই শঙ্কিত হতে লাগলেন, ছেলেবেলা তাঁর মাতাল, ঘোড়া ও সাহেবদের উপর বিজাতীয় ভয় ও ঘৃণা ছিল, তিনি অনেক বার মাতালের ভয়ানক অত্যাচারের গল্প শুনেছিলেন। একবার এক-জন মাতাল বাবু তাঁর হরি মন্দিরটি জিব দিয়ে চেটে নিয়েছিল ও কিছু দিন হল আর এক প্রিয়শিষ্য একটা ভেটো ঘোড়াব নাথিতে অসময় প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং অতি বিনীতভাবে বললেন, 'বাবু! আমরা গোঁসাইগোবিন্দ লোক সঙ্গীতের আমরা কি ধার ধারি! তবে প্রেমসে কহো রাধাবিনোদ, হরি ভক্তের প্রেমের—তাঁরি প্রেমে দুটো সংকীর্তন করে মনকে শান্ত করে থাকি।' ক্রমে ব্রাহ্মবাবু সেই ক্ষণমাত্র সেবিত আরকের তেজ অনুভব কত্তে লাগ্‌লো, ঘাড়টি দুলতে লাগলো, চক্ষু দুটি পাক্‌লো হয়ে জিব কথঞ্চিৎ আড়ষ্ট হতে লাগলো, অনেক ক্ষণের পর 'ঠিক্ বলেচো বাপ!' বলে গাড়ির গদি ঠেস দিয়ে হেলে পড়লেন এবং খানিকক্ষণ এই অবস্থায় থেকে পুনবায় উঠে প্রেমানন্দের দিকে ওত করে ঝুঁকতে লাগলেন ও শেষে তাঁর হাতটি ধরে বললেন, 'বাবাজী! আমরা ইয়ারলোক, প্রাণ গড়ের মাঠের মত খোলা! শোনো একটা গাই, আমিও বিস্তর ঢপের গীত জানি, প্রভুর সেবাদাসী আছে তো?' বলে হা! হা! হা! হেসে টলে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে হাত নেড়ে চিৎকার করে এই গান ধল্লেন :

চায় মন চির দিন, পুজিতে সেই পুতুলে।
রঙ চঙে চক্‌চকে, সাধে কি ছেলে ভুলে॥
ডাক রাং অভ্রে, চিক্‌মিক ঝিক্‌মিক্ করে।
তায় সোনালী রূপালী চুন্‌কি বসনে আলো করে॥

আহ্লাদে পেহ্লাদে কেলে, তামাকখেগো বুড়ো ফেলে।
কও কেমনে রহিব খেলাঘর কিসে চলে॥
চির পরিচিত প্রণয় সহজে কি ভগ্ন হয়।
থেকে থেকে মন ধায় চোরাসিঙ্গী পাটের চুলে॥
শম্মার সাহস বড় ভূতের নামে জড়োসড়ো,
ঘরে আছেন গুণবতী, গঙ্গাজলে গোবর গুলে॥

সঙ্গীত শেষ হবার পুর্বেই কেরাঞ্চী রেলওয়ে টরমিনাসে উপস্থিত হল। ব্রাহ্মবাবু টল্‌তে টল্‌তে গাড়ি থামবার পুর্বেই প্রেমানন্দের নাকটা খাম্‌চে নিয়ে ও জ্ঞানানন্দের চুলগুলা ধরে গাড়ি হতে তড়াক করে লাফিয়ে পড়্‌লেন।

আজ আর্মানিঘাট লোকারণ্য, গাড়ি পালকির যেরূপ ভিড়, লোকেরও সেইরূপ রল্লা। বাবাজীরা সেই ভিড়ের মধ্যে অতিকষ্টে গাড়ি হতে অবতীর্ণ হলেন। তল্পিদার, ছড়িদার, সেবাৎ ও শিষ্যেরা পরস্পরের পদানুরূপ প্রোশেসন বেঁধে প্রভুদ্বয়কে মধ্যে করে শ্রেণী দিয়ে চললেন। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ দুজনে পরস্পর হাত ধরাধরি করে হেল্‌তে দুল্‌তে যাওয়ায় বোধ হতে লাগলো যেন একটা আর্‌সুলা ও কাঁচপোকা একত্র হয়ে চলেচে।

টুনুনাং ণ্টাং টুনুনাং ণ্টাং করে রেলওয়ে ইষ্টিম ফেরী ময়ূরপঙ্খীর ছাড়বার সংকেতঘণ্টা বাজ্‌চে, থার্ডক্লাস বুকিং আপিসে লোকের ঠেল মেরেচে, রেলওয়ের চাপরাসীরা সপাসপ্‌ বেত মাচ্চে, ধাক্কা দিচ্চে ও গুঁতো লাগাচ্চে, তথাপি নিবৃত্তি নাই। 'মশাই শ্রীরামপুব!' 'বালি বালি!' 'বর্ধমান মশাই!' 'আমার বর্ধমানেরটা দিন না' শব্দ উঠচে, চারি দিকে কাঠের বেড়া-ঘেরা বুকিংক্লার্ক সন্ধ্যা পুজার অবসরমত ঝোপ বুঝে কোপ ফেলচেন। কারো টাকা নিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোয়ানি দেওয়া হচ্চে, বাকি চাবামাত্র 'চোপ রও' ও 'নিকালো', কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট বেরুচ্চে, কেউ টিকিটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চিৎকার কচ্চে, কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। কমফর্টার মাথায় জড়িয়ে ঝড়াক্‌ ঝড়াক্‌ করে কেবল টিকিটে নম্বর দেবার কল নাড়চেন, শিস দিচ্চেন ও উপরি পয়সা পকেটে ফেলচেন, পাইখানার কাটা দরজার মত ক্ষুদে জানলাটুকুতে অনেকে হজুরের মুখ দেখতে পাচ্ছে না যে কথা কয়ে আপনার কাজ লয়। যদি চিৎকার করে ক্লার্ক বাবুর চিত্তাকর্ষণ কত্তে চেষ্টা করে, তখনি রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে! এদিকে সেকেন ক্লাস ও গুড্‌স ও লগেজ ডিপার্টমেণ্টেও এই

প্রকার গোল। সেখানে ক্লার্কবাবুরাও কতক এই প্রকার, কিন্তু এত নয়। ফার্স্টক্লাস সাহেব বিবির স্থল, সেখানে টুঁ শব্দটি নাই, ক্লার্ক রিক্তহস্তে টিকিট বেচতে আসেন ও সেই মুখেই ফিরে যান, পান তামাকের পয়সাও বিলক্ষণ অপ্রতুল থাকে। বাবাজীরা নটবরবেশে থার্ড ক্লাস বুকিং আপিসের নিকট যাচ্চেন, এমন সময় টুন্টুনাংন্টাং টুন্টুনাংন্টাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো, ফোঁস ফোঁস্ করে ইষ্টিমারের ইষ্টিম ছাড়তে লাগলো, লোকেরা রল্লা বেঁধে, জেটি দিয়ে ইষ্টিমারে উঠতে লাগলো—জল্দি! চলো! চলো! শব্দে রেলওয়ে পুলিসের লোকেরা হাঁকৃতে লাগ্‌লো। বাবাজীরা অতি কষ্টে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে টিকিট চাইলেন। বুকিং ক্লার্ক বাবাজীদের চেহারা দেখে ফিক্ করে হেসে হাত বাড়িয়ে টাকা চেয়ে নিয়ে টিকিট কাটতে লাগলেন। এদিকে ঝ্যাপ্ ঝ্যাপ্ শব্দে ইষ্টিমারের হুইল ঘুরে ছেড়ে দিলে। এদিকে প্রেমানন্দ 'মশাই টিকিটগুলি শীঘ্র দিন শীঘ্র দিন ইষ্টিম খুললো ইষ্টিম চললো' বলে চিৎকার কত্তে লাগলেন, কিন্তু কাটা কপাটের হজুরের ভ্রূক্ষেপ নাই, শিস দিয়ে 'মদন আগুন জল্‌চে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী' গান ধল্লেন—'মশাই শুন্‌চেন কি? ইষ্টিম খুলে গেল, এর পর গাড়ি পাওয়া ভার হবে, এ কি অত্যাচার মশাই!' ক্লার্ক 'আরে থামো না ঠাকুর' বলে এক দাবড়ি দিয়ে অনেকক্ষণের পর কাটা দরজা হতে হাত বাড়িয়ে টিকিটগুলি দিয়ে দরজাটি বন্ধ করে পুনরায় 'ইচ্ছা হয় যে উহার পরে প্রাণ সপে সই হইগে দাসী, মদন আগুন—' 'মশাই বাকি পয়সা দিন, বলি দরজা দিলেন যে?' সে কথায় কে ভ্রূক্ষেপ করে? 'জমাদার, ভিড় সাফ্ করো, নিকালো, নিকালো' বলে ক্লার্ক সেই কাঠগড়ার ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, রেল পুলিসের পাহারাওলা ধাক্কা দিয়ে বাবাজীদের দলবল সমেত টরমিনাস্ হতে বার করে দিলে—প্রেমানন্দ মনে মনে বড়ই রাগত হয়ে মধ্যে মধ্যে ফিরে ফিরে বুকিং আপিসের দিকে চাইতে লাগলেন। এদিকে ক্লার্ক কাটা দরজার ফাটল দিয়ে মদন আগুনের শেষটুকু গাইতে গাইতে উঁকি মাত্তে লাগলেন।

বাবাজীরা কি করেন, অগত্যা টরমিনাস্ পরিহার করে অন্য ঘাটে নৌকার চেষ্টায় বেরুলেন—ভাগ্যক্রমে সেই সময় পাশের ঘাটের গহনার ইষ্টিমারখানি খোলে নাই। বাবাজীরা আপনাপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়ে অতিকষ্টে সেই ইষ্টিমারে উঠে পেরিয়ে পড়লেন—গহনার ইষ্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপ্‌টানে হটপ্রেসের ফরমার মত ও ইক্ষু কলের গাঁটের

মত জাঁত সহ্য করে, পারে পড়ে কথঞ্চিৎ আরাম পেলেন এবং নদীতীরে অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেই এস্টেশনে উপস্থিত হলেন। টুঙ্গুনাংণ্টাং টুঙ্গুনাংণ্টাং শব্দে একবার ঘণ্টা বাজলো। বাবাজীরা একবার ঘণ্টা বাজবার উপেক্ষা করার ক্লেশ ভুগে এসেছেন, সুতরাং এবার মুকিয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষা কত্তে লাগলেন—প্রেমানন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে ট্রেনের পথ দেখচেন,জ্ঞানানন্দ নস্য লবার জন্যে শামুকটা ট্যাঁক হতে বার করবার সময় দ্যাখেন যে, তাঁর টাকার গেঁজেটি নাই। অমনি 'দাঁদাঁ সর্বনাশঞ হলঁ। সর্বনাশঞ হলঁ! আমার গেঁজেটি নাই' বলে কাঁদ্‌তে লাগলেন ; প্রেমানন্দ, ভায়ার চিৎকার ও ক্রন্দনে যারপরনাই শোকার্ত হয়ে চিৎকার করে গোল কত্তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা 'চপ্‌রাও' 'চপ্‌রাও' করে উঠলো, সুতরাং পাছে পুনরায় এস্টেশন হতে বার করে দ্যায় এই ভয়ে আর বড় উচ্চবাচ্য না করে মনের খেদ মনেই সংবরণ কল্লেন। জ্ঞানানন্দ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন ও ততই নস্য নিয়ে নিয়ে শামুকটা খালি করে তুললেন।

এদিকে হস হস্ হস্ করে ট্রেন টর্‌মিনাসে উপস্থিত হল, টুঙ্গুনাংণ্টাং টুঙ্গুনাংণ্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, লোকেরা রল্লা করে গাড়ি চড়তে লাগলো, থার্ড ক্লাসের মধ্যে গার্ড ও দুজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক পোরা হতে লাগলো,

ভেতর থেকে 'আর কোথা আস্‌চো!' 'সাহেব আর জায়গা নাই' 'আমার বুঁচকি! আমার বুঁচকিটা দাও।' 'ছেলেটি দেখো! আ মলো মিন্‌সে ছেলের ঘাড়ে বসেছিস্ যে!' চিৎকার হতে লাগলো, কিন্তু রেলওয়ে কর্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত বলেই তাদৃশ চিৎকারে কর্ণপাত করেন না। এক

একখানি থার্ড ক্লাস কাঁকড়ার গর্তের আকার ধারণ কল্লে, তথাপিও মধ্যে মধ্যে দুই-একজন এস্টেশন মাস্টার ও গার্ড গাড়ির কাছে এসে উঁকি মাচ্চেন—যদি নিশ্বাস ফ্যাল্‌বার স্থান থাকে, তা হলে আরও কতকগুলো যাত্রীকে ভরে দেওয়া হয়। যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্লাক্‌-হোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখলে একদিন এঁদের এজেন্ট ও লোকোমোটিব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে সাহস করে বলতে পাত্তেন যে, তাঁদের থার্ডক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্লাক্‌হোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড় কম নয়।

এদিকে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দও দলবল নিয়ে একখানি গাড়িতে উঠলেন, ধপাধপ্‌ গাড়ির দরজা বন্ধ হতে লাগলো, 'হরকরা চাই মশাই! হরকরা স্যার হরকরা' 'ডেলিন্যু স্যার! ডেলিন্যুস!' কাগজ হাতে নেড়েরা ঘুচ্চে—লাবেল! ভালো লাবেল! লাল খেরোর দোবুজান কাঁধে চাচারা বই বেচ্চেন—টুঙ্গুনাংণ্টাং টুঙ্গুনাংণ্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, এস্টেশন মাস্টার ক্ষুদে সাদা নিশেন হাতে করে মাথায় কমফর্টার জড়িয়ে বেরুলেন, 'অল্‌রাইট বাবু?' বলে গার্ড হজুরের নিকটস্থ হল—'অল্‌রাইট। গুট্‌মর্নিং স্যার' বলে এস্টেশন মাস্টার নিশেনটা তুললেন—এঞ্জিনের দিকে গার্ড হাত তুলে যাবার সংকেত করে পকেট হতে ক্ষুদে বাঁশীটি নিয়ে শিসের মত শব্দ কল্লে, ঘটাঘট্‌ ঘটাস্‌ ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘটাস্‌ শব্দে গাড়ি নড়ে উঠে হস্‌ হস্‌ হস্‌ করে বেরিয়ে গেল।

এদিকে বাবাজীরা চাটগাঁ ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরগের মত থার্ড ক্লাসবদ্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কত্তে কত্তে চললেন—জ্ঞানানন্দ বাবাজীর মুখের কাছে দুজন পেঁড়োর আয়মাদার আবক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রুসহ বিরাজ করায় রসুনের খোস্‌বে'জয়দেবের বংশধর যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে আয়মাদারের চামরের মত দাড়ি বাতাসে উড়ে জ্ঞানানন্দের মুখে পড়চে, জ্ঞানানন্দ ঘৃণায় মুখ ফেরাবেন কি? পেছন দিকে দুজন চীনেম্যান হাত রুমালে খানার ভাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েচে। প্রেমানন্দ গাড়িতে প্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু এখনো পদার্পণ কত্তে পারেন নাই। একটা ধোপার মোটের সঙ্গে ও গাড়ির পেনেলের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িটি এমনি ঠেস মেরে গেছে যে গাড়িতে প্রবেশ করে পর্যন্ত শূন্যেই রয়েচেন। মধ্যে মধ্যে ভুঁড়ি চড চড় কল্লে এক একবার কারু কাঁধ ও কারু মাথার উপর হাত দিয়ে অবলম্বন কত্তে চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু ওত সাব্যস্ত হয়ে উঠচে না—তাঁর পাশে এক মাগী একটি কচি ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়েচে, বাবাজী হাত ফ্যাল্‌বার পুর্বেই মাগী 'বাবাজী করো

কি! করো কি! আমার ছেলেটি দেখো!' বলে চিৎকার করে উঠচে, অমনি গাড়ির সমুদায় লোক সেই দিকে দৃষ্টিপাত করায় বাবাজী অপ্রস্তুত হয়ে হাত দুটি জড়োসড়ো করে ধোপাব বুঁচ্‌কি ও আপনার ভুঁড়ির উপর লক্ষ্য কচ্চেন—ঘর্ম্মে সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্চে। গাড়ির মধ্যে একদল গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী যাত্রার দল ছিল, তার মধ্যে একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া—'বাবাজীর ভুঁড়িটা বুঝি ফেঁসে যায়' বলে পাপিয়ার ডাক ডেকে ওঠায় গাড়ির মধ্যে একটা হাসির গর্‌রা পড়ে গেল—'প্রভো! তোমার ইচ্ছা' বলে প্রেমানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। এদিকে গাড়ি ক্রমে বেগ সংবরণ করে থাম্‌লো, বাইরে 'বালি! বালি! বালি!' শব্দ হতে লাগ্‌লো।

বালি একটা বিখ্যাত স্থান। টেকচাঁদের বালির বেণীবাবুও বিখ্যাত লোক—আলালের ঘরের দুলাল মতিলাল বালি হতেই তরিবত পান; বিশেষতঃ বালির ব্রিজটাও বেশ। বালির যাত্রীরা বালিতে নাবলেন। ধোপা ও গঙ্গাভক্তির দলটা বালিতে নাবায় প্রেমানন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—দলের ছোঁড়াগুলো নাব্‌বার সময় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে একটা চিম্‌টি কেটে গেল। উতরপাড়া বালির লাগোয়া, আজকাল জয়কৃষ্টের কল্যাণে উতরপাড়া বিলক্ষণ বিখ্যাত। বিশেষতঃ উতরপাড়ার মডেল জমিদারেব নর্ম্যাল ইস্কুল প্রায় ইস্কুলের কোর্সলেক্‌চরর ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা হোল্ডর, শুনতে পাই, গুরুজীর দু-একটি ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লিশকর্ম্মা হয়ে বেরিয়েচেন!

বাবাজীবা যে সকল এস্টেশন পার হতে লাগলেন, সেই সকলেবই এস্টেশন মাস্টার, সিগনেলার, বুকিংক্লার্ক ও অ্যাপ্রিনটিসদের এক প্রকার চরিত্র, এক প্রকার মহিমা। কেউ মধ্যে মধ্যে অকারণে 'পুলিসম্যান পুলিসম্যান' করে চিৎকার করে সহসা ভদ্রলোকের অপমান কত্তে উদ্যত হচ্চেন। কেউ দুটি গরীব বেওয়ার জীবনসর্বস্ব স্বরূপ পুঁটলিটি নিয়ে টানাটানি কচ্চেন—ওজন কচ্চেন। কোথাও বাঙালগোছের যাত্রী ও কোমরে টাকাব গেঁজেওয়ালা যাত্রীর টিকিট নিজে নিয়ে পকেটে ফেলে পুনরায় টিকিটের জন্যে পেড়াপিড়ি করা হচ্চে—পাশে পুলিসম্যান হাজির। কোন এস্টেশনের এস্টেশন মাস্টার কমফর্টার মাথায় জড়িয়ে চীনে কোটের পকেটে হাত পুরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চেন—অ্যাপ্রিন্‌টিস ও কুলিদের উপর মিছে কাজের ফরমাস করা হচ্চে, হঠাৎ হুজুরের কমাণ্ডিং আস্‌পেক্‌ট দেখে একদিন 'ইনি কে হে?' বলে অভ্যাগত লোকে পরস্পর ফুইসপর কত্তে পারে। বলতে কি, হুজুর তো কম

লোক নন—দি এস্টেশন মাস্টার!

যে সকল মহাত্মারা ছেলেবেলা কলকেতার চীনে বাজারে 'কম স্তার! গুড শপ্ স্তার! টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ একবার তো সি!' বলে সমস্ত দিন' চিৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, এম্‌টি হাউস, সাতপুকুর ও দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও ক্লায়েণ্টের অবস্থা বুঝে বিনানুমতিতে পকেট হাত্‌ড়ান, আরসুলার কাঁচপোকার রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলে 'দি এস্টেশন মাস্টার' হয়ে পড়েচেন—যে সকল ভদ্রলোক একবার রেলওয়ে চড়েচেন, যাঁদের সঙ্গে একবার মাত্র এই মহাপুরুষরা কন্‌ট্যাক্‌টে এসেচেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্মচারীদের সর্বদাই কমপ্লেন করে থাকেন। ভদ্রতা এঁদের নিকট যেন 'পুলিসম্যানের' ভয়েই এগুতে ভয় করেন, শিষ্টাচার ও সরলতাব এঁরা নামও শোনেন নাই, কেবল লাল সাদা গ্রীন্ সিগন্যাল—এস্টেশন, টিকিট ও অত্যাচারই এঁদের চিরারাধ্য বস্তু! ও আগেই স্বজাতির অপমান কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর!